বিজ্ঞানচর্চা: প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ

সুব্রত বড়ুয়া

বিজ্ঞানচর্চা ঃ প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ

সুব্রত বড়ুয়া

মুক্তধারা

"বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের অনুরোধে বি. সি. আই. সি.-র খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে উৎপাদিত হ্রাসকৃত মূল্যের 'লেখক' কাগজে মুদ্রিত।"

মুক্তধারা ১২৩২

প্রকাশক
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০
প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪
প্রচ্ছদশিল্পী সমর মজুমদার
মুদ্রাকর
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০
মূল্য সাদা ২৫·০০ টাকা
লেখক কাগজ ১৭·০০ টাকা

BIJNAN CHARCHA : PRASANGO O ONUSHANGO
[Essays on Study of Science in Developing Countries]
By Subrata Barua
First Edition June 1987
Cover Design Samar Majumdar
Publisher C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj Dhaka 1100
Bangladesh
Price Whiteprint Taka 25·00
Lekhakprint Taka 17·00

অগ্রজ
সমর বড়ুয়া

এই লেখকের বিজ্ঞান বিষয়ক অন্যান্য বই

চাঁদে প্রথম মানুষ। বিদ্যুতের কাহিনী। বিজ্ঞানের ইতিকথা ঃ সন্ধানী মানুষ। সৌরজগৎ।

প্রাসঙ্গিক নিবেদন

একালে বিজ্ঞান-শিক্ষার পদ্ধতিগত বিষয়টি নানা দিক থেকে পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে, নানা দেশে। শিক্ষা-সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞগণ সে দায়িত্ব পালন করবেন এবং তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক পর্যায়ে তাঁরা তার মূল্যায়নও করবেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ছাত্র বলেই বিজ্ঞান-শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন এবং কৌতূহল দু'টিই জাগে। কখনো আপন চিন্তা, আবার কখনো বা নানা গ্রন্থ কিংবা রচনা পাঠ এবং এমনকি কারো কারো সঙ্গে নেহাত অ-সেমিনারীয় আলাপের মাধ্যমে সে সব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ এবং কৌতূহল নিবৃত্ত করার প্রয়াস পেয়েছি বিভিন্ন সময়ে। একসময় ভাবলাম—এসব চিন্তা-ভাবনা নিয়ে কিছু লেখা যেতে পারে। দৈনিক সংবাদ-এর সাহিত্য-সম্পাদক বন্ধুবর আবুল হাসনাত সংবাদ-এর সাময়িকী পাতায় বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু লিখতে বলায় প্রায় চার বছর আগে লেখা হয়েছিলো দু'টি রচনা 'তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞানচর্চা' এবং 'বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রসঙ্গে'। এর পর ১৯৮৩ সালে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চা' শীর্ষক সংকলন গ্রন্থের জন্য লিখেছিলাম 'বিজ্ঞান-শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চা'। এর প্রায় তিন বছর পর ১৯৮৬ সালে বাংলা একাডেমী এবং বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদ-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'বিজ্ঞান লেখক সম্মেলনে'র জন্য লিখেছিলাম 'বিজ্ঞান-লেখকের সামাজিক ভূমিকা'। রচনাটি পরে দৈনিক ইত্তেফাক-এর ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৬ তারিখে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে মুদ্রিত হয়। 'বিজ্ঞানচর্চা : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ' রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে অধ্যাপক মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'সুন্দরম'-এর প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায়।

প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত বলে প্রায় প্রত্যেকটিতেই নানা বিষয় পুনরুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কারণেই তা ঘটেছে, কেননা গ্রন্থ-পরিকল্পনা মনে রেখে এগুলি রচিত হয়নি। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবৃন্দ এ ত্রুটি নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

আগেই উল্লেখ করেছি, বিশেষজ্ঞ হিসেবে নয়, একজন সাধারণ কৌতূহলী মানুষ হিসেবেই গ্রন্থভুক্ত রচনাসমূহে বিষয়াবলী উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। ভাবনা-চিন্তায় ধারাবাহিকতা বা বিষয়-সংশ্লিষ্টতা অক্ষুণ্ন রাখা এই লেখকের পক্ষে সর্বত্র সম্ভব হয়নি। তবুও রচনাগুলি যদি বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে পাঠককে কৌতূহলী ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয় তাহলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো।

'মুক্তধারা'র প্রাণপুরুষ শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন সাহা এবং এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মী বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে অকুণ্ঠ সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

সুব্রত বড়ুয়া
জুন ৮,১৯৮৭

প্রবন্ধসূচী

বিজ্ঞান-শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চা ৯
বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রসঙ্গে ২০
তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞানচর্চা ২৮
বিজ্ঞান-লেখকের সামাজিক ভূমিকা ৩৪
বিজ্ঞানচর্চা : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ ৪৬

বিজ্ঞান-শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চা

১.

আজকের প্রযুক্তি-নির্ভর ও প্রযুক্তি-প্রধান বিশ্বের যে কোনো-দেশে বিজ্ঞানচর্চা যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য আবশ্যক বিষয় এ সম্পর্কে ভিন্ন চিন্তার কোন অবকাশ নেই। বস্তুত যে কোনো দেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধির অন্তর্লীন অবকাঠামোর মৌল পরিতল কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উন্নয়নের প্রশ্ন আজ বিশশতকীয় প্রযুক্তি-জ্ঞানের ওপর এত বেশি নির্ভরশীল যে, উন্নত ও উন্নয়নগামী দেশসমূহের মধ্যে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর স্পষ্ট ও মৌলিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও প্রাগ্রসর প্রযুক্তির বাণিজ্যিক সম্ভার প্রতিনিয়তই অতি স্বল্প সময়কালের মধ্যেই উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে প্রেরিত হচ্ছে এবং গ্রহীতা দেশ তার সীমিত সম্পদের মোটা একটি অংশ নিয়োজিত করতে বাধ্য হচ্ছে এই প্রযুক্তি-সম্ভূত সম্ভারের বাণিজ্যিক খরিদ্দার হিসেবে। বলাবাহুল্য, এই প্রেরণ ও গ্রহণ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই মূলত একমুখী এবং এই সম্ভার আবার প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকছে শিল্পজাত বাণিজ্যিক উপকরণের মধ্যে। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলো আধুনিক প্রযুক্তির রকমারী ফসল নিত্য-নিয়ত কিনে আনছে ঘরে, কিন্তু যে প্রযুক্তি এই ফসল উৎপাদন করছে সেই প্রযুক্তির প্রকৃত রূপ-কাঠামোটিকে আয়ত্ত করতে পারছে না। অথচ অন্যদিকে ক্রীত প্রযুক্তি-সম্ভারের অব্যাহত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এসব দেশকে দক্ষ ও প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত জনশক্তি তৈরি করতে হচ্ছে এবং এই জনশক্তি তৈরির

প্রয়োজনেও আবার তাদের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে সেই প্রযুক্তি-বিক্রেতা দেশগুলোর কাছেই। অতএব আধুনিক প্রযুক্তি-সম্ভারের ব্যবহার ক্ষেত্রেও উন্নয়নগামী দেশগুলো সম্মুখীন হচ্ছে এক অন্তহীন সমস্যার এবং এই সমস্যা সমাধানের কোন নিকট-উপায় বাস্তবে এসব দেশের করায়ত্ত হওয়ার সম্ভাবনা মোটেই তেমন উজ্জ্বল নয়। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি—সত্যিকার পরিস্থিতি হচ্ছে অল্প কিছু সংখ্যক প্রাগ্রসর দেশ প্রযুক্তিকে একটি লাভজনক পণ্য হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ লাভ করেছে এবং এই পণ্যজাত উপকরণ রপ্তানি করে বিশ্ব-বাজারে তারা তাদের নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা আরো দৃঢ় ও পাকাপোক্ত করে নিতে পারছে। এ ছাড়াও প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ দেশগুলো তাদের এই সুবিধাজনক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রকারান্তরে তাদের ক্রেতা দেশ হিসেবে বেঁচে থাকতে বাধ্য করছে। বলা প্রয়োজন, এই অধমর্ণ-ভূমিকার তাৎপর্য অনুধাবন সত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রায় সকলেই এতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে প্রধানত নিজেদের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দুর্বলতার কারণেই।

এই পরিস্থিতির আলোকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান-শিক্ষা ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানচর্চার সীমিত পরিসরের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রথাগত সীমিত প্রয়োজন মেটাতে তৈরি শিক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ম নিষ্ঠ বিজ্ঞানচর্চাও মূলত পর-নির্ভর ও আমদানিকৃত প্রযুক্তি-সম্ভারের সেবায় নিয়োজিত থাকতে বাধ্য হয়েছে, নতুন উদ্ভাবনের উৎসমুখ হতে পারে নি। এ কারণেই উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিজ্ঞানচর্চা সীমিত থাকছে পাঠ্য-সূচীর শিথিল অনুসরণ এবং ডিগ্রী-লাভান্তে সন্তোষজনক চাকরি ও ক্ষমতা লাভের মতো নগদ-বিদায়ী তৎপরতায়। বস্তুত এ দৃষ্টিভঙ্গি কোনো ব্যক্তিকে

বিবেচনার কারণে উদ্ভূত নয়, বরং সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অবশ্যম্ভাবী ফলক্রিয়া রূপেই উদ্ভূত। আমাদের বাংলা-দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, আত্মশ্লাঘা-বর্জিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টির দিকে তাকালেই আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হয় যে, প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক বিজ্ঞানচর্চায় আমরা প্রসম্ভার, প্রয়োজন ও প্রয়োগের বিষয়টির প্রতি তেমন সচেতন নই, যেরূপ সচেতনতা এক্ষেত্রে আবশ্যিক পূর্বশর্ত হওয়া উচিত ছিলো। ফলে এই নিয়মানুগ বিজ্ঞানচর্চা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, বরং স্নাতক-পর্যায়ের বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের মধ্যেও তেমন কোনো রেখাপাত করতে পারে নি, এমন কি তাদের প্রায় নিস্তরঙ্গ শিক্ষা-প্রয়াসেও এর কোনো অভিঘাত সৃষ্টি হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গি, নিশ্চয়ই, আশাব্যঞ্জক নয়। নয় প্রত্যাশাপূর্ণ ভবিষ্যতের পরিপূরক।

২.

আমাদের অবশ্যই স্বীকার করা উচিত—বিজ্ঞান যেমন কোনো অনপেক্ষ আকস্মিক বিষয় নয়, তেমনই নয় কোনো সম্পর্কহীন বিমূর্ত চেতনা। জগৎ ও জীবনের মূলে নিহিত যে পরম রহস্য—বিজ্ঞান তারই পরম্পরামূলক সম্পর্ক অনুসন্ধানের সচেতন প্রয়াসমাত্র। এই প্রয়াসের মাধ্যমেই বিজ্ঞানীরা বস্তু ও শক্তির সম্পর্ক আবিষ্কারের সাহায্যে বস্তুজগতের রহস্য উদ্ধার এবং জাগতিক বস্তুগত উপাদানের নিপুণ ব্যবহার সম্ভব করে তুলেছেন। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যথার্থ অর্থে শুধুমাত্র তত্ত্ব আবিষ্কার কিংবা তথ্য আহরণেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তত্ত্ব ও তথ্যের যোগ্য ব্যবহার দ্বারা মানবজীবনকে আরো ফলপ্রসূ করে তোলার প্রয়াসেও বিস্তৃত হয়েছে। অতএব প্রকৃত বিজ্ঞান-শিক্ষা শিক্ষার্থীকে শুধু পুঁথিগত বিদ্যার্জনের দিকেই

আকর্ষণ করে না, শিক্ষার্থীর অধীত বিদ্যার যথার্থ ব্যবহারের দিকেও টেনে নিয়ে যায়। শিক্ষার এই ব্যবহার দ্বারাই শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে অনুসন্ধিৎসু ও জিজ্ঞাসু, তার দৃষ্টির সীমানা হয় ক্রমপ্রসারিত।

বিজ্ঞানের ইতিহাসের মৌলিক আবিষ্কারগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, এই জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসার নিত্য অনুরণন। অতএব, শিক্ষার ফলশ্রুতিতে এই অনুরণন সৃষ্টি যদি সম্ভব না হয়, তাহলে বৎসরান্তিক পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন মূলত শুধু কাগুজে স্বীকৃতির লক্ষ্যবস্তুতেই পরিণত হবে, এর ক্রমসংবদ্ধ বিষয়াবলী হয়ে উঠবে না একটি অখণ্ড চারিত্র্য অর্জনের মৌলিক উপাদান। ফলে এই শিক্ষা যেমন মৌলিক আবিষ্কারের পাথেয় হতে পারবে না, তেমনই পারবে না হতে প্রায়োগিক দক্ষতার শাণিত হাতিয়ার।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞানচর্চার এই আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন যে যথোচিতভাবে সফল হয়ে উঠতে পারছে না তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, বিজ্ঞান-শিক্ষা কিংবা বিজ্ঞানচর্চায় এই মৌলিক বিষয়টির প্রতি কখনো প্রকৃত ও যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। বিশেষত গুরুত্ব আরোপের জন্য যে আত্যন্তিক তাগিদ অনুভব করা প্রয়োজন, তা কখনো বাস্তব সাংগঠনিক উদ্যোগে পরিণত হওয়ার সুযোগ লাভ করেনি। এর কারণ, এ ধরনের সাংগঠনিক উদ্যোগের পেছনে যে বাস্তব ও যুক্তিনির্ভর প্রেরণা কাজ করা উচিত ছিলো, সে প্রেরণার বিস্তৃত পরিসরও সৃষ্টি হয়নি। তাই কখনো কখনো নীতিগতভাবে বিজ্ঞান-শিক্ষার দুর্বলতাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে মাত্র, কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে এসব দুর্বলতা পরিহারের কথা বলা হয়েছে। তদুপরি এসব দুর্বলতা পরিহারের প্রয়াস প্রধানত বরাবরই সীমাবদ্ধ থেকেছে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন প্রয়াসে, কখনো পরিব্যাপ্ত হয়নি সামগ্রিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের জটিল বাস্তবতায়।

বলাবাহুল্য, বিশ-শতকের এই প্রায় শেষ পর্যায়ে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রটি যে কতখানি দুরূহ ও জটিল হয়ে উঠেছে তার প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় মোটেই কোনো সহজ বিষয় নয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁর পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপ ও আমেরিকা এবং অন্য কয়েকটি দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে অবিশ্বাস্য অগ্রগতি ঘটেছে, তার সামগ্রিক পরিধি নির্ণয় যথার্থই কঠিন। এই অগ্রগতির লেখচিত্রে সময় ও সম্প্রসারণ মোটেই মেনে চলেনি নির্দিষ্ট কোন অনুপাত। তাই আজকের বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীকে প্রতিনিয়তই সম্মুখীন হতে হচ্ছে বিষয়ের বিরাট ব্যাপ্তির। তাকে অতি অল্প সময়ে জানতে হচ্ছে যেমন অনেক বেশি তেমনই জ্ঞাত বিষয়ের ক্রম-প্রসারমান ব্যবহার সম্পর্কেও হয়ে উঠতে হচ্ছে অনেক বেশি দক্ষ ও পারঙ্গম। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পাঠক্রম যে এই পারঙ্গমতা অর্জনের পক্ষে যথোপযুক্ত নয় সে কথা আমরা সবাই স্বীকার করি। তাই বলতে হয়, আমাদের বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীরা, বহুলাংশে, বিজ্ঞানচর্চা করে না। তারা পড়ে, যথানিয়মে পরীক্ষা-পাশ করে এবং যথারীতি জীবিকার্জনের প্রয়োজনের ছকটিতে নিজেদের গুটিয়ে ফেলে। এরপর তাদের চর্চার পক্ষটি রুদ্ধ হয়ে যায় এবং জানার জগতটি হয়ে পড়ে সাংঘাতিক রকম সীমিত। সীমিত, কেননা বিজ্ঞান-শিক্ষা এসব শিক্ষার্থীর অধিকাংশের নিকটই আদ্যোপান্ত একটি প্রথাগত অনুসরণ মাত্র, উপলব্ধির নতুন দিগন্ত সন্ধান নয়।

পক্ষান্তরে শিক্ষাসূচী নির্দেশিত পাঠক্রম অনুসরণমূলক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অপর যে মৌলিক ত্রুটি লক্ষ্যগোচর, তা হচ্ছে—এই অধ্যয়ন ও পঠন-পাঠন অনেকাংশেই সীমিত থাকে নিয়মানুগ পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নসূচীর মধ্যেই, বিষয়ের সামগ্রিক অনুধাবনে নয়। ফলে দেখা যায়, অত্যন্ত উজ্জ্বল ও চমৎকার শিক্ষাজীবন

সত্ত্বেও এসব শিক্ষার্থী বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের অধীত বিষয় সম্পর্কে যথার্থ ধারণা অর্জনে সক্ষম হয় না। ফলশ্রুতিতে, উত্তরকালে শিক্ষক, গবেষক কিংবা প্রয়োগ-কর্মী হিসেবে এদের অনেকের ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় তাৎপর্যহীন এবং এদের এই তাৎপর্যহীন ভূমিকাই আবার ক্রমিক তাৎপর্যহীনতার একটি অর্থহীন বৃত্ত নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। অতঃপর বিজ্ঞান-কর্ম পর্যবসিত হয় আমলাতান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতায় এবং এই রীতিবদ্ধ নিয়মানুবর্তিতার অনিঃশেষ বৃত্ত হয়ে ওঠে ধারকরা প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি নির্দিষ্ট প্রথাগত ক্ষেত্র, এমন কি অভ্যাসগত প্রযুক্তির ন্যূনতম প্রকৌশলগত ব্যত্যয়ও এই প্রয়োগপরিসরে অনুসৃত শৃঙ্খলা ও অনুক্রম বিনষ্ট করার জন্য যথেষ্ট।

৩.

বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মৌলিক ফাঁকি তাই ক্রমে একটি বিশাল ও অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়ায় বিজ্ঞানের বিকিরণশীল উদ্ভাবনমূলক ভূমিকার পথে। বস্তুত সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এ এমন এক অদৃশ্য অথচ জটিল জট যা খুলতে চেষ্টা করতে গিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো নিরন্তর হিমসিম খেয়ে চলেছে। অতএব উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞানচর্চার পুরো বিষয়টি সম্মুখীন হয়েছে এক ক্রম-সম্প্রসারণশীল ধাঁধার এবং এ ধাঁধার যথার্থ সমাধান নির্ণয়ে এসব দেশের প্রয়াস প্রতিনিয়তই নিত্যনব সমস্যা ও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে বাধ্য হচ্ছে। তবে একথা বলার অর্থ এই নয় যে, উন্নত দেশগুলির সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ছিটে-ফোঁটা এসব দেশ বাস্তবে ব্যবহার করতে পারছে না কিংবা প্রাগ্রসর বিজ্ঞান-চিন্তা ও প্রয়োগ-কর্মের সংবাদ থেকে তারা বঞ্চিত। বহিরঙ্গের দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আধুনিক

প্রযুক্তিনির্ভর বহু সম্ভার ব্যবহৃত হচ্ছে নিয়মিত, এমন কি জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন-যাপনেও। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখতে গেলেই বুঝা যায়, এরূপ বিচ্ছিন্ন প্রযুক্তি-সংলগ্নতা সত্ত্বেও উৎপাদন ও জীবন-ব্যবস্থার মৌলিক অবকাঠামো যেমন এসব দেশে যথাযথভাবে প্রযুক্তি-নির্ভর হয়ে উঠতে পারেনি, তেমনই বৃহত্তর জনমানসের সামগ্রিক চিন্তা-চেতনাও প্রযুক্তির অন্তরালবর্তী বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার যৌক্তিক বিন্যাস বিষয়ে মোটেই কৌতূহলী হয়ে ওঠেনি। অতএব, এই প্রেক্ষাপটে, বিজ্ঞানচর্চাও মূলত খণ্ডিত হয়ে থাকছে অনন্যোপায় জীবিকানির্ভর বিজ্ঞান-সংলগ্নতায়। তাই কদাচিৎ এই সংলগ্নতা আত্মনিমগ্ন সত্য-সাধনায় উন্নীত হয়, কিংবা উন্নীত হলেও সামগ্রিক চেতনাগত পশ্চাৎপদতা ও অনুকূল পরিবেশের অনুপস্থিতির কারণে তার পক্ষে মৌলিক উদ্ভাবন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এ পর্যায়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তির উপযোগী প্রসম্ভার সংগ্রহের বিষয়টি আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই আলোচনা মোটেই কোনো সম্পর্কহীন বিষয় নয়। কারণ একালে বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির অধ্যয়ন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রটি অনেক বেশি প্রাগ্রসর ও জটিল। ফলে এযাবৎ জ্ঞাত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিতি এবং সমকালীন বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের ধরন-ধারণ ও ক্ষেত্র সম্পর্কে ব্যাপক পরিচয় ফলপ্রসূ বিজ্ঞানচর্চার পক্ষে একটি অবশ্যপূরণীয় শর্ত এবং এই শর্তের তাৎপর্য অনুধাবন ও তা পূরণের সার্বিক প্রয়াস একান্তই অপরিহার্য।

অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহে সংগঠিত বিজ্ঞানচর্চার প্রতিবন্ধকতার শিকড় মূলত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে প্রাথমিক বিবেচ্য হিসেবে বলা

যায়, বিজ্ঞান-শিক্ষা ও বিজ্ঞাচর্চাকে কেবল জীবিকা-নির্ভর বা পেশাগত প্রক্রিয়া রূপে চিহ্নিত করা হলে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড অবশ্যই একটি বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত প্রয়াস রূপেই প্রতিভাত হবে, জীবন-সম্পৃক্ত পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূরক বিজ্ঞান-মনস্কতা হিসেবে নয়। বস্তুত বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী ও বিজ্ঞান-কর্মীদের প্রতিভা ও কর্মপ্রয়াসকে উৎপাদন ও আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পর্কিত করা সম্ভব না হ'লে বিজ্ঞানচর্চার বাস্তব উপযোগিতা যেমন উপেক্ষিত হবে, তেমনই বিজ্ঞান-কর্মীরা প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রেরণা থেকেও বঞ্চিত হবেন। অথচ সীমিতভাবে হলেও এই প্রেরণা যদি না থাকে তাহলে বিজ্ঞান-কর্মী, গবেষক ও প্রযুক্তিবিদরা তাঁদের বিচ্ছিন্ন অবস্থানে বন্দী হয়ে থাকবেন এবং প্রায়োগিক গবেষণার লক্ষ্য কখনো অর্জিত হবে না।

৪.

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন বিজ্ঞানচর্চার একটি মৌলিক অপরিহার্য শর্ত। বলাবাহুল্য, বিজ্ঞানের ইতিহাস বলতে শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের উল্লেখ এবং বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন-প্রয়াসের রোমাঞ্চকর ঘটনা-বর্ণনাকেই নির্দেশ করা হয় না। বিজ্ঞানের ইতিহাসকে প্রকৃতপক্ষে বস্তুজগতের রহস্য উন্মোচন ও প্রকৃতিজগতের প্রতিভাসসমূহের সূত্র-সন্ধানের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন নামেও অভিহিত করা যায়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বস্তুত কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসের একটি পরিপূরক দিক হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তির ক্রমোন্নয়ন। অতএব বিজ্ঞানের ইতিহাসের সম্যক তাৎপর্য অনুধাবন সম্ভব কেবল মানবসমাজের ক্রমবিকাশের সাথে এর প্রকৃত সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমেই। এই

সম্পর্কের আলোকে বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ করা যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন এই পাঠ থেকে শিক্ষা গ্রহণেরও। অন্যথায় বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের বর্তমান কালের বিজ্ঞানচর্চায় কোন ভূমিকা পালন করতে পারে না, তথা বর্তমানের বৈজ্ঞানিক প্রয়াস ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক চিন্তার সাথে রচনা করতে পারবে না কোনো সেতুবন্ধ।

এ কারণেই বিজ্ঞানচর্চার যথার্থ ভবনটি নির্মাণের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট পরিচয় এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো—বিজ্ঞানের ইতিহাসকে প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করার জন্য একালে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে নিরীক্ষণ করা হচ্ছে বিভিন্নমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে। এই নিরক্ষীণ সচেতন ভাবনা-জগতকে যেমন উত্তরণমুখী করে তুলছে, তেমনই জীবন-সম্পৃক্ত বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রকেও করছে প্রসারিত। কেননা, বিজ্ঞানচর্চার প্রকৃত অধিষ্ঠান হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির জীবনাচরণের মধ্যেই।

তাই বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইতিহাস-চেতনার গঠনমূলক ভূমিকার প্রয়োজন উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি বলেই পাশ্চাত্য দেশসমূহে বিজ্ঞানের ইতিহাসকে, ইদানীংকালে, বারংবার পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে এবং ইতিহাসের এই ভূমিকাকে স্পষ্টতর করে তোলার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে বহু গ্রন্থ। উন্নয়নশীল দেশসমূহে এ বিষয়ে তেমন কোনো সচেতন আগ্রহ এ-যাবৎ সৃষ্টি হয়নি বললেই চলে, যদিও বিজ্ঞানচর্চার আরো দ্রুত ও কার্যকর প্রসার সম্ভব করে তোলার ব্যাপারে নীতিগতভাবে এসব দেশ ব্যাপক কর্ম-প্রয়াস শুরু করার প্রয়োজন স্বীকার করে আসছে অনেক আগে থেকেই।

৫.

সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তাই, দেখা যায়, বিজ্ঞানচর্চার কার্যকর প্রসার একটি জটিল ও শ্রমসাধ্য বিষয়। এর বাস্তবায়নে নীতিগত সিদ্ধান্ত ছাড়াও প্রয়োজন ব্যাপক উদ্যোগ এবং বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গি। এই প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে বাংলাদেশের বিজ্ঞান-শিক্ষা পদ্ধতি ও বিজ্ঞানচর্চার সীমিত পরিসর সম্পর্কে একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার সূত্রপাত এখানে করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রাথমিক সূচনা হয় বিদ্যালয়ের শ্রেণী-কক্ষ থেকে। কিন্তু এই সূচনাকে কোনোক্রমেই যুগোপযোগী কিংবা যথার্থ বিষয়োপযোগী বলে মেনে নেয়া চলে না। শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কিত একাধিক বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদনে তাই বারংবার এ কথাটাই বলা হয়েছে যে, এ দেশের বিজ্ঞান-শিক্ষাকে কালোপযোগী করে তোলা প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজনকে মেনে নিয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা বিষয়ক পাঠক্রম তৈরির জন্য বিভিন্ন সুপারিশও পেশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, পাঠক্রমের সুবিন্যাস ছাড়াও বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক বিবিধ প্রসম্ভারের ব্যাপক সরবরাহ নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে এসব প্রতিবেদনে। অর্থাৎ সুলিখিত ও সুবিন্যস্ত পাঠ্যপুস্তকের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্য প্রয়োজন বিশেষভাবে সজ্জিত পরীক্ষণাগারেরও। আবার এ দু'টি অবশ্য প্রয়োজনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত বিজ্ঞান-শিক্ষকের প্রশ্নটিও এবং সবশেষে আসে পাঠক্রমভুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষার পরিপূরক গ্রন্থরাজি কিংবা পত্র-পত্রিকার কথা। বলাবাহুল্য বিজ্ঞান-শিক্ষাকে যথার্থ কার্যকর ও অর্থবহ করে তোলার জন্য এসব প্রসম্ভার বিষয়ে আরো বাস্তবমুখী ভাবনা-চিন্তা প্রয়োজন এবং

সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এসব ভাবনা-চিন্তাকে সংগঠিতভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা।

আমাদের মনে রাখা উচিত—বর্তমান কালে বিজ্ঞান-শিক্ষার পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রতিদিন তা বিস্তৃততর হচ্ছে। অতএব বিজ্ঞান-শিক্ষাকে কালোপযোগী করার মূল পরিকল্পনা রচনার কাজটি অতি দুরূহ। আরো দুরূহ এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার কাজ। কেননা, এই বাস্তবায়নের সাথে জড়িত রয়েছে অর্থ-সংস্থানের বিষয়টিও। শিক্ষার উপকরণ যথাসম্ভব দেশীয় উৎস থেকে সংগ্রহ করা ছাড়াও পাঠক্রমের নিয়মিত পর্যালোচনাও হওয়া উচিত আমাদের দেশীয় চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিস্তর থেকে। তবে সবচেয়ে বড় কথা—বিজ্ঞান-শিক্ষার সমস্ত পর্যায় নিয়ে কালোপযোগী বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুধাবন, যেহেতু ফলপ্রসূ ও উদ্ভাবন-মুখী বিজ্ঞানচর্চার অবশ্যপূরণীয় পূর্বশর্ত হচ্ছে ক্রমপরম্পরামূলক শিক্ষার মাধ্যমে স্বচ্ছ বিষয়গত ধারণা অর্জন।

বস্তুত আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় সবচেয়ে অবহেলিত হচ্ছে এই অবশ্যপূরণীয় শর্তটিই এবং বিজ্ঞানচর্চার পক্ষে এটিই হচ্ছে অন্যতম অন্তরায়। সন্দেহ নেই, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর বাইরে রেখে এ প্রশ্নটিকে বিচার করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই সাথে বিজ্ঞানচর্চা প্রসঙ্গে স্বচ্ছ যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজন আমাদের অস্তিত্বের জন্য, উন্নয়নের জন্য এবং জীবনের জন্য। বিজ্ঞানচর্চার বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতটিকেও তাই বিবেচনা করতে হবে সামগ্রিক জীবনমুখী দৃষ্টিকোণ থেকেই। অন্যথায়, তথাকথিত বিজ্ঞানচর্চা নেহাৎ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপ কিংবা ব্যক্তিক উচ্চাভিলাষের সামগ্রী হয়েই থাকবে—উদ্ভাবন. আবিষ্কার ও প্রায়োগিক পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে নয়।

বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রসঙ্গে

“বিজ্ঞানের ইতিহাস’ কথাটি আমাদের দেশের বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী ও বিজ্ঞান-কর্মীদের কাছে নিতান্ত অপরিচিত অথবা অত্যন্ত স্বল্প-পরিচিত একটি বিষয়। পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়াবলীর বাইরে বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ ও রচনা বলতে আমরা প্রধানত বিভিন্ন আবিষ্কারের কাহিনী কিংবা বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীদের জীবনী ইত্যাদিই বুঝে থাকি। তৎসঙ্গে সরস ভঙ্গিতে লেখা মৌলিক বৈজ্ঞানিক বিষয়ও মাঝে-মধ্যে আমাদের পাঠের অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু ‘বিজ্ঞানের ইতিহাস’ বলতে বিজ্ঞানচর্চার ধারাবাহিকতার যে ব্যাপ্তি বুঝানো হয় তা এ ধরনের গ্রন্থে বা রচনায় বিধৃত হওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনীর আখ্যানমূলক বর্ণনাও ইতিহাস হিসেবে গণ্য হতে পারে না, কেননা ইতিহাসচর্চা, বর্তমানকালে গৃহীত অর্থে, মূলত ঘটনাবলী ও তথ্যাদির কোন আনুপূর্বিক সন্নিবেশ নয়, বরং তা সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো তথা দেশ-কাল ও জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ ও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত এক গভীর অর্থবহ অনুসন্ধান যা অতীত থেকে উৎসারিত হয়ে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ‘বিজ্ঞানের ইতিহাস’ বলতে আমরা তাই যেমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং বিজ্ঞানমুখী চিন্তাচেতনার ধারাবাহিক ক্রমপ্রসারের বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ বুঝি, তেমনি তা আবার আমাদের সমকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোকে নিসর্গ ও বস্তুর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের দিকটিই নির্দেশ করে। ফলে বিজ্ঞানের ইতিহাসের যৌক্তিক অনুসরণ ও অনুধাবন বর্তমান কালের বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তি-পরিকল্পনাকে ভবিষ্যতের প্রয়োজনমুখী করে

গড়ে তোলার ভিত হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে অবশ্যই এই সম্পর্কের সূত্র নির্ণয় অভিনিবেশ অধ্যয়ন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার নির্মোহ প্রতিফলন দাবি করে সবচেয়ে বেশি। কারণ এ সূত্র নির্ণয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের প্রাথমিক প্রয়াস।

আমাদের বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাবলীর সমগ্র পরিমণ্ডলে বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রসঙ্গটি কোথাও তেমন গুরুত্ব সহকারে উল্লেখিত হয়নি। সম্ভবত এ কারণেই সাহিত্য, সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদির পাঠক্রমে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার পরিচয় লাভ ও তার প্রাসঙ্গিক বিচার অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে সচেতন ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অনুসরণের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত করার কোনো প্রয়াস এ যাবৎ পরিলক্ষিত হয়নি। অতএব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে আমরা যত বেশি ব্যক্তিক প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য ও সাফল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি, ততখানি গুরুত্ব সহকারে মানব-সমাজের যুক্তিবাদিতা ও অভিজ্ঞতার ক্রমপ্রসারণের মৌলিক ফসল হিসেবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। কিংবা কখনো শিথিলভাবে এই ক্রমবিকাশ-সংশ্লিষ্টতা স্বীকার করে নিলেও এতদ-সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের বিষয়টিকে তেমন তাৎপর্যবহ বলে স্বীকার করে নিইনি। এ কারণেই বিভিন্ন সময়ে, আমার মনে হয়েছে, আমাদের বিজ্ঞানচর্চার মৌলিক বিকাশের ক্ষেত্রে পর্বত-প্রমাণ প্রতিবন্ধকতার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি-সম্পর্কিত ইতিহাস-চেতনা সম্পর্কে আমাদের এই অতুলনীয় নিস্পৃহতা।

প্রসঙ্গত একটি কথা এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, এ-যাবৎ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের কোনো যথার্থ ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়নি

এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক বাহবা-ধন্য রচনাসমূহের প্রায় সিংহভাগই, মূলত, যথার্থ বিচারে বিজ্ঞানবিষয়ক ঘটনা ও তথ্যের শিশুতোষ পরিবেশনার মাঝেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক রচনা হিসেবে পরিগণিত আমাদের অধিকাংশ রচনার পরিমণ্ডল আমরা সীমিত করে রেখেছি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন-এর আখ্যান বর্ণনার মধ্যেই। ফলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সচেতনতার নির্দেশক রচনা যেমন রচিত হয়নি, তেমনি বিরল দু'একটি ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা দেখা গেলেও আমরা তাকে যুক্তিহীন অবহেলায় অংকুরেই ধ্বংস করে দিয়েছি। অথচ বিজ্ঞানমনস্কতা তথা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞান-চিন্তার ক্ষত্রে দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্য ও সাবালকত্ব অর্জন বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হিসেবে চিহ্নিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় সমস্ত আনুষঙ্গিক উদ্দীপনা সত্ত্বেও পাঠক্রম অনুসারী বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও প্রথাগত বৃত্তাবদ্ধ বিজ্ঞানচর্চা একটি তাৎপর্যহীন ও লক্ষ্যহীন প্রয়াসে পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সর্বাধিক। বিজ্ঞান কোনো স্বয়ম্ভূ বস্তু নয়। আদিম যুগে মানুষ তার জীবনধারণ ও জীবন-প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় ক্রমবিকাশের কারণেই অর্জন করেছিল আদিম প্রযুক্তি-জ্ঞান। অতঃপর এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ক্রমশ সময়ের অগ্রগতি ও জীবন-বাস্তবতার মাধ্যমে আরো প্রসারিত হয়েছে, হয়েছে আরো বেশি সংহত। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির এই প্রসার ও উন্নয়ন দেশ-কাল ও সমাজ কাঠামোর সাথে যেমন সম্পর্কিত, তেমনি তার ক্রমপ্রসার নির্ভর করেছে প্রাতিষঙ্গিক যুগের মানুষের চিন্তার ব্যাপ্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির সচ্ছতার উপর। প্রাচীন যুগের বিজ্ঞানচর্চার বিবরণ ও ইতিহাস থেকে আমরা বুঝতে পারি, প্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ওর জিজ্ঞাসা যেখানে অযৌক্তিক কুসংস্কার

দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, বিজ্ঞানের চর্চা ও অগ্রগতি সেখানেই স্তব্ধ হয়েছে। বলাবাহুল্য, মানুষের জীবনযাত্রার প্রকৃতিই ছিল জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন। প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে সংঘাত মুহূর্তে মানুষকে তাই আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই আশ্রয় নিতে হয়েছে উদ্ভাবনার এবং এই উদ্ভাবনে আবার প্রকৃতিই হয়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রধান উপাদান ও উপকরণ। অতএব, প্রকৃতির সম্ভার ব্যবহার করতে গিয়েই মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই ব্যবহারিক প্রযুক্তি সৃষ্টি করেছে এবং ক্রমে প্রয়োজনের তাগিদেই সহজাত অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে আদি প্রযুক্তির জটিল সম্প্রসারণ সম্ভব করেছে। এভাবে মানবজাতির সাধারণ বিজ্ঞান-মনস্কতা তৈরি হয়েছে তার জীবনের অস্তিত্ব, স্বাচ্ছন্দ্য ও আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই। আমরা জানি, আদিম প্রযুক্তি পর্যন্ত পৌঁছতে মানুষকে যেমন অতি দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান অতিক্রম করতে হয়েছে, তেমনি জয় করতে হয়েছে অনেক অপ্রতিরোধ্য প্রতিকূলতাও। এই প্রতিকূলতা যেমন এসেছে প্রকৃতির দিক থেকে, তেমনি এসেছে মানুষের নিজের দিক থেকেও।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করা হয় তবে আমরা বিশ শতকীয় আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর সাফল্য পর্যন্ত পৌঁছতে মানুষের চিন্তার ক্রমপ্রসারের দিকটি উপলব্ধির দিকে হয়তো এগিয়ে যেতে পারি। এই এগিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে যে কথাটি আমাদের সবচেয়ে বেশি মনে রাখা আবশ্যক তা হচ্ছে, বিজ্ঞানে আবিষ্কার ও উদ্ভাবন কখনো আকস্মিক একটি ঘটনা হিসেবে আবির্ভূত হয়নি। ঘটনার আকস্মিকতা কিংবা অপ্রত্যাশিত সংঘটন যেখানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভাবনার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণরূপে চিহ্নিত হওয়ার অবকাশ ঘটেছে এবং আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার আখ্যানরূপে সেসব সংঘটন

ও আকস্মিকতা বর্ণিত হয়েছে—তার বিশ্লেষণ থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায়, এসব ঘটনা বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলত অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীর বাস্তব ও তথ্যনিষ্ঠ সচেতন মানসিকতায় নতুন চিন্তার যোগসূত্র হিসেবেই কাজ করেছে। বস্তুত বিজ্ঞানী এসব আকস্মিকতার পূর্ব থেকেই তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভাবনার জগৎটিকে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ও আবিষ্কারের জন্য অনুকূল করে তৈরি করে তুলেছিলেন এবং যে কোনো আকস্মিক বা অভাবিতপূর্ব ঘটনা তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রটিকে ফলপ্রসূ করার কাজটি ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। বস্তুত বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ও আবিষ্কার একটি দীর্ঘ ও ব্যাপক ধারাবাহিক সচেতন প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি এবং এই প্রয়াসের অন্তরালে থাকে একটি সচেতন স্থির লক্ষ্যাভিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি।

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ইতিহাসে এমন বহু বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে যা হাজার বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও মৌলিক ভাবনার দিক থেকে ছিল অবিকৃত ও অভিন্ন। কিন্তু এসব বিষয় সমাধান ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যুগ-ব্যবধানের বৈশিষ্ট্যসূচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন অবশ্যই ঘটেছে। নিঃসন্দেহে এর ফলে পূর্বকালের চিন্তার বিষয়টি যেভাবে ও যে পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হয়েছে পরবর্তীকালে তাতে আরো নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে যে সব বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা হয়েছে তা কোনো যুগের বিশেষ ফসল নয়, বরং এসব ভাবনার পেছনে অতীত যুগের যোগসূত্র, অনেক সময়, ছিল অত্যন্ত প্রবল। বিশ্বজগতের মূল কাঠামো সম্পর্কিত চিন্তার বিষয়টি এখানে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। পৃথিবীর আকার, সূর্যের সাথে তার অবস্থানগত সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় সুদীর্ঘ কাল ধরে জ্যোতি-বিদদের গবেষণার বিষয় ছিল। দীর্ঘকাল ধরে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে

বিভিন্ন যুগে জ্যোতির্বিদরা বিভিন্ন নক্ষত্র ও গ্রহের অবস্থান ও গতির হিসাব করেছেন, অথচ পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে আপন কক্ষপথে ঘুরছে সে কথাটি প্রতিষ্ঠা করতে তাঁদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং এই একটি বিষয়ে অতীতের বহু পর্যবেক্ষণ দীর্ঘকাল পরেও গবেষণার উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস পদার্থ তথা বস্তুর মৌলিক গঠন-কাঠামোর সর্বশেষ অবিকৃত অবস্থা বর্ণনার জন্য যে 'অ্যাটম' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তার বাস্তব অস্তিত্বের হদিস মিলেছে ডেমোক্রিটাসের মৃত্যুর প্রায় দু'হাজার বছর পর। অতএব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সূত্রান্বেষণ শুধু সমকালীন চিন্তা ও অভিজ্ঞতার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং মানবজাতির ক্রমপুঞ্জিত অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সামগ্রিক ব্যাপ্তির সর্বত্রই তার যোগসূত্রের সন্ধান মিলতে পারে। অন্বিষ্ট সব বিজ্ঞানকর্মীকেই তাই দৃষ্টি অবারিত ও চিন্তা উন্মুক্ত রাখতে হবে এবং বিবেচ্য বিষয়ের সার্বিক তথ্য সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবহিত থাকতে হবে। অতএব, এ-কথা স্বীকার করতে দ্বিধা করা উচিত নয় যে, বিজ্ঞানের ক্রমপ্রসার ও অগ্রগামিতার বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন বিজ্ঞানচর্চার যথার্থ লক্ষ্যাভিমুখী নির্দেশনার জন্য একটি আবশ্যক পূর্বশর্ত রূপে বিবেচিত হওয়া উচিত। বিশেষতঃ বিজ্ঞান যেখানে আজকের মানুষের জীবনযাত্রায় একটি প্রত্যক্ষ ও প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ, সেখানে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে অনগ্রসর দেশসমূহে বিজ্ঞানচর্চার প্রায়োগিক গুরুত্ব ও সাফল্য নির্ভর করবে প্রধানতঃ সার্বিক বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টি ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ওপর। এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন আরো বেশী প্রয়োজন এই কারণে যে, বর্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞান একক ব্যক্তিপ্রচেষ্টার পরিধি অতিক্রম করে

পরিকল্পিত সমবায়িক বৃহৎ উদ্যোগ হিসেবেই অধিকতর দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে এবং সেখানে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ।

বিজ্ঞানের ইতিহাসের রূপরেখা সম্পর্কে সচেতনতা তাই এ যুগের বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানমনস্কতার একটি অপরিহার্য পরিপূরক বিষয় হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এই বাস্তবতা সম্পর্কে আমরা উদাসীন। এবং উদাসীন বলেই প্রাচীন বিজ্ঞান থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের বিজ্ঞান পর্যন্ত বিজ্ঞানের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের আলোচনা এখনো আমাদের বৈজ্ঞানিক রচনায় মূলতঃ অনুপস্থিত। এর ফলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ ও তদসংশ্লিষ্ট প্রয়াসের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের গুরুত্ব অনুধাবন আমাদের পক্ষে খুব সহজ হয়ে ওঠেনি। এ জন্যই সাধারণভাবে, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ও আবিষ্কারসমূহকে আমরা গ্রহণ করেছি ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির পৃথক সাফল্য অথবা একক মানব-মনীষার সূচক-মানের অভিব্যক্তি হিসেবে, মানব-সভ্যতা ও মানবসমাজের অগ্রগতির অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হিসেবে নয়। অথচ সভ্যতা ও প্রযুক্তির অগ্রগতির আলোকে বিজ্ঞানচর্চার এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিবেচনা করলে আমরা হয়তো বস্তুগত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পাশাপাশি মানবজাতির চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমপ্রসারমান উজ্জ্বলতার বিষয়েও কিছুটা ধারণা অর্জন করতে পারি। অন্যথায় আমাদের যাবতীয় বিজ্ঞানচর্চা হয়তো নিছক সর্বাধুনিক প্রযুক্তি আহরণের প্রয়াসেই সীমিত থাকতে বাধ্য হবে এবং এর ফলে উৎপাদন সংশ্লিষ্টতা কিংবা ভোগ্য উপকরণের দিকটিই সবসময় প্রাধান্য লাভ করে যাবে। সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানচর্চার আবশ্যক ভিত্তি হিসেবে বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টির যে প্রস্তাবটি বহুল উচ্চারিত, তার বাস্তবায়নের জন্যও প্রয়োজন বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে বিজ্ঞানকর্মীদের যথার্থ পরিচ্ছন্ন ও

সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন। বস্তুতঃ এই ধারণা অর্জিত না হলে বিজ্ঞান-চর্চার স্বরূপ ও প্রকৃতি অনুধাবন সম্ভব নয়, কেননা বিজ্ঞান এক অর্থে জগৎ ও জীবনের মূলানুসন্ধানের অপরিহার্য হাতিয়ারও বটে। অতএব এই বহুমুখী জটিল ও শাণিত হাতিয়ারটির ধারাবাহিক বিকাশ সম্পর্কে অবহিত না হলে তার যথার্থ সদ্ব্যবহার সম্পর্কে সংশয়ী ও দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই বললেও চলে।

তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞানচর্চা

আজকের প্রযুক্তি-নির্ভর ও প্রযুক্তি-প্রধান বিশ্বের যে কোনো দেশে বিজ্ঞানচর্চা যে একটি অতি আবশ্যক বিষয় এ সম্পর্কে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। বস্তুতঃ জাতীয় সমৃদ্ধির সূচক কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যে কোনো বিষয় আজ বিশ শতকীয় প্রযুক্তি জ্ঞানের ওপর এত বেশি নির্ভরশীল যে উন্নত ও উন্নয়নগামী দেশসমূহের মধ্যে প্রযুক্তি-কাঠামোর সুস্পষ্ট মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রযুক্তির বাণিজ্যিক সম্ভার অতি অল্পকালের মধ্যেই উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পৌঁছে যাচ্ছে এবং গ্রহীতা দেশ তার সীমিত সম্পদের মোটা একটি অংশ নিয়োজিত করতে বাধ্য হচ্ছে এই প্রযুক্তির বাণিজ্যিক খরিদ্দার হিসেবে। এই গ্রহণ মূলতঃ এক তরফা এবং তাও সীমাবদ্ধ থাকছে প্রযুক্তিসঞ্জাত উপকরণের মধ্যেই। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলি প্রযুক্তির ফসল কিনে আনছে নিজর ঘরে, কিন্তু যে প্রযুক্তি এই ফসল সৃষ্টি করছে তার মূল জ্ঞানের অধিকারী হতে পারছে না। অন্য দিকে ক্রীত প্রযুক্তি-সম্ভারের অপরিহার্য ব্যবহার অব্যাহত রাখার জন্য এ সব দেশকে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তি তৈরি করতে হচ্ছে এবং এই জনশক্তি তৈরির জন্যও তাদের আবার যেতে হচ্ছে সেই প্রযুক্তি বিক্রেতা দেশটির কাছেই। অতএব, সত্যিকার পরিস্থিতি হচ্ছে মুষ্টিমেয় সংখ্যক দেশ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করছে একটি লাভজনক পণ্য হিসেবে এবং এই পণ্য-জাত উপকরণ রপ্তানি করে বিশ্ব-বাজারে তাদের ঈর্ষণীয় আসনটি আরো পাকা-

পোক্ত করে নিচ্ছে। এছাড়াও প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ দেশগুলি তাদের এই সুবিধাজনক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে প্রকারান্তরে বাধ্য করছে তাদের প্রযুক্তি-নির্ভর দেশ হিসেবে বেঁচে থাকতে।

এই পরিস্থিতির আলোকে উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিজ্ঞানচর্চার দিকে তাকালে আমরা যথার্থই বুঝতে পারি ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় মূলতঃ প্রশাসনের প্রয়োজন পূরণের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার মতো এই পর-নির্ভর বিজ্ঞানচর্চাও আসলে আমদানীকৃত প্রযুক্তি-সম্ভারের সেবায় নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়েছে—নতুন উদ্ভাবনের উৎস-মুখ হতে পারেনি। এ কারণেই উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞানচর্চা সীমিত থাকছে পাঠ্যসূচীর অনুসরণ এবং ডিগ্রী লাভান্তে সন্তোষজনক চাকরি-লাভের মতো নগদ বিদায়। বস্তুতঃ এ দৃষ্টিভঙ্গি কোনো ব্যক্তিক বিবেচনার কারণে উদ্ভুত নয়, বরং সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানচর্চায় সচেতন আর্থ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের কারণেই সৃষ্ট।

আমাদের নিশ্চয়ই স্বীকার করা উচিত বিজ্ঞান যেমন কোনো বিমূর্ত বিষয় নয়, তেমনি নয় কোনো সমাজ-সম্পর্কহীন চেতনা। জগৎ ও জীবনের মূলে নিহিত যে পরম রহস্য—বিজ্ঞান তারই পরম্পরামূলক সুশৃঙ্খল সম্পর্ক সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস। এই প্রয়াসের সাহায্যেই বিজ্ঞানীরা বস্তুজগতের রহস্য উন্মোচন এবং জাগতিক বস্তুগত উপাদানের নিপুণ ব্যবহার সম্ভব করে তুলেছেন। অর্থাৎ বিজ্ঞান-শিক্ষা যথার্থ অর্থে শুধু তত্ত্ব শিক্ষা কিংবা তথ্য আহরণে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলে না, বরং তা শিক্ষার্থীকে দান করবে সেই অবিসংবাদিত চেতনা যা বাস্তব জগতের সমস্ত উপাদানের প্রতি করে তুলবে তাকে অনুসন্ধিৎসু ও জিজ্ঞাসু। বিজ্ঞানের ইতিহাসের মৌলিক আবিষ্কারসমূহের দিকে তাকালে আমরা দেখি এই

অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসার বিজয়। অতএব, এই অনুরণন সৃষ্টি যদি সম্ভব না হয় তবে পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত বিষয়াবলী শুধুমাত্র শিক্ষার স্বীকৃতি অর্জনের হাতিয়ার হয়েই থাকবে, হয়ে উঠবে না কোনো মৌলিক আবিষ্কার প্রয়োগের শাণিত উপকরণ।

আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলি বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এই আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন যে যথোচিতভাবে সফল হয়ে উঠতে পারছে না তার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিজ্ঞানচর্চার এই মৌলিক বিষয়ের প্রতি যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। বলাবাহুল্য বিশ শতকের এই প্রায় শেষ পর্যায়ে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রটি যে কতখানি কঠিন ও দুরূহ হয়ে উঠেছে তার প্রকৃত অবস্থা অনুমান করাও অত্যন্ত কঠিন। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে প্রধানতঃ আমেরিকা ও ইউরোপ মহাদেশে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য অগ্রগতি ঘটেছে এবং এই অগ্রগতির ফলে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র যে কতখানি প্রসারিত হয়ে পড়েছে সাধারণভাবে তা অনুমান করা আমাদের পক্ষে হয়তো অত্যন্ত কঠিন। এ সময়ে তাই বিজ্ঞানচর্চায় ব্রতী শিক্ষার্থীকে যেমন অতি অল্প সময় অনেক বেশি জানতে হচ্ছে, তেমনই জ্ঞাত তথ্যের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কেও নিজেকে করে তুলতে হচ্ছে পারঙ্গম। কিন্তু আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পাঠক্রম এই পারঙ্গমতা অর্জনের জন্য যে যথোপযুক্ত নয়—এ কথা আমরা সবাই জানি এবং স্বীকার করি। তাই আমাদের বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানচর্চা করে না, কেবল বিজ্ঞান পড়ে। তারা পড়ে, পাস করে এবং জীবিকার্জনের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকে, এবং তার বেশি জানার জন্য কখনো উৎসাহী হয়ে উঠতে তেমন অনুপ্রাণিত হয় না। উৎসাহী হয়ে ওঠে না কারণ উৎসাহী হয়ে ওঠার তেমন কোনো প্রয়োজনও দেখা দেয় না। অন্যদিকে পাঠক্রম অনুসরণে যে মৌলিক ত্রুটি থেকে যায় তা হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধ্যয়ন সীমিত

থাকে নানা প্রতিকূল অবস্থা ও ঘটনার কারণে সৃষ্ট সঙ্কুচিত পাঠ্যসূচীর মধ্যেই, বিষয়ের সামগ্রিক চর্চায় নয়। ফলে দেখা যায়, অত্যন্ত চমৎকার শিক্ষাজীবন সত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে এসব বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর অধিকাংশই কখনো তাঁদের অধীত বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করেন না। এ কারণে শিক্ষক, গবেষক কিংবা কর্মী হিসেবে এসব ব্যক্তির ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় তাৎপর্যহীন। এবং এই তাৎপর্যহীন ভূমিকাই আবার তাৎপর্যহীনতার একটি অপ্রতিরোধ্য বৃত্ত নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। অতঃপর এই অপ্রতিরোধ্য বৃত্ত হয়ে ওঠে ধার করা প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র মাত্র, এমনকি প্রযুক্তির ন্যূনতম শর্তও হয়ে ওঠে নাটকের অসহায় মৃত সৈনিক...যথার্থই ভূমিকাহীন পুতুল।

বিজ্ঞান-শিক্ষার এই মৌলিক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা তাই ক্রমে বিশাল একটি প্রতিবন্ধ হয়ে ওঠে বিজ্ঞানের বিকিরণশীল উদ্ভাবনমূলক ভূমিকার পথে। বস্তুতঃ এ এমন এক অদৃশ্য অথচ জটিল জট যা খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো নিরন্তর হিমসিম খেয়ে উঠছে। অতএব উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞানচর্চা এখনো এমন এক রহস্যময় গোলক ধাঁধার সম্মুখীন হয়ে আছে যে ধাঁধাটির যথার্থ সমাধান নির্ণয়ে এসব দেশ এ-যাবৎ সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু একথা বলার অর্থ এই নয় যে, সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ছিটে-ফোঁটা এসব দেশ বাস্তবে ব্যবহার করতে পারছে না। অবশ্যই পারছে। এবং বহিরঙ্গের দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায়, তৃতীয় বিশ্বের এসব দেশ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর নানা সম্ভার ব্যবহার করছে তাদের দৈনন্দিন জীবনেও। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখতে গেলেই বুঝতে পারি, আধুনিক প্রযুক্তির এরূপ সংলগ্নতা সত্ত্বেও মৌলিক অবকাঠামো যেমন সম্পূর্ণ প্রযুক্তি-নির্ভর হয়ে উঠতে পারেনি, তেমনি জনসাধারণের মানস-চেতনাও

প্রযুক্তির অন্তরালবর্তী বৈজ্ঞানিক সাধনা বিষয়ে মোটেই কৌতূহলী হয়ে ওঠেনি। এই প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানচর্চাও মূলতঃ খণ্ডিত হয়ে থাকছে জীবিকা-নির্ভর অনন্যোপায় বিজ্ঞান সংলগ্নতায়। কদাচিৎ এই সংলগ্নতা আত্মনিমগ্ন সাধনায় পর্যবসিত হয়, কিংবা পর্যবসিত হলেও সামগ্রিক চেতনাগত পশ্চাৎপদতার কারণে তার পক্ষে মৌলিক উদ্ভাবন প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে বিজ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভার সংগ্রহ অথবা আর্থ-সামাজিক পরিবেশের প্রতিকূলতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনার শর্ত হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এই আবির্ভাব মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ এ কালে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টি অনেক বেশি জটিল ও প্রাগ্রসর, ফলে এ যাবৎ জ্ঞাত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত থাকা এবং সমকালীন বৈজ্ঞানিক প্রয়াস সম্পর্কে ধারণা অর্জন বিজ্ঞানচর্চার পক্ষে একটি অবশ্যপূরণীয় শর্ত। এই শর্তের তাৎপর্য উপেক্ষা করার অবকাশ নেই।

অতএব, বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রতিবন্ধকতার শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিজ্ঞান-চেতনাকে জীবিকা-নির্ভর বৈজ্ঞানিক প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত করা হলে তা অবশ্যই একটি খণ্ডিত রূপেই আবির্ভূত হবে, সামগ্রিক বিজ্ঞান-মনস্কতার পরিপূরক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে নয়। বস্তুতঃ বিজ্ঞানকর্মীদের প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্বেও আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিত যদি বিজ্ঞানচর্চার পক্ষে অনুকূল মানস-ভূমি তৈরি না করতে পারে, তাহলে বিজ্ঞান-কর্মীরা বিজ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রেরণা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবেন। অথচ এই প্রেরণার অবর্তমানে বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি একান্তই অসম্ভব। বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের এই ধারণাই দেয়।

অতএব উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞানচর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কে বলা যায়, বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ এবং একটি সুদূরপ্রসারী সামগ্রিক পরিকল্পনা ও সচেতন আন্তরিক প্রয়াস ব্যতীত বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণজাত প্রয়াস দ্বারা এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। সম্ভব নয়, কেননা বিজ্ঞানচর্চা শুধু তত্ত্ব ও প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের সূত্র অনুসরণ নয়, বরং প্রকৃত অর্থে জীবনচর্চার সামগ্রিকতার একটি প্রধান ও বিশিষ্ট অঙ্গ—যা বর্তমানকালের পটভূমিতে পালন করছে অপ্রতিরোধ্য এক বিরাট ও বিশিষ্ট ভূমিকা।

বিজ্ঞান-লেখকের সামাজিক ভূমিকা

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার মনে করেন, আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে যুক্তিবাদ শুধু যে জ্ঞানের বিকাশ ও পার্থিব উন্নতি সাধন করেছে তা নয়, বরং তা এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধও সৃষ্টি করেছে। বস্তুতঃ আধুনিক সমাজের বিচ্ছিন্নতাবোধ কথাটি একালে বিশেষভাবে উচ্চারিত। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ কেবল যে বায়বীয় বোধ নয়, তা যখন অনুভূত হয়, তখন একপেশে ভাবনা থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও ক্রমপ্রসারমান জটিল নগর জীবন সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হওয়া, কারো কারো ক্ষেত্রে, একেবারে অসম্ভব নয়। এ কথা ঠিক, গোষ্ঠীবদ্ধ আদিম মানবসমাজ নতুন নতুন আবিষ্কার ও উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তনের মধ্য দিয়েই সমাজ-প্রগতি এবং যুগোপযোগী মূল্যবোধ অর্জন করেছে। সমাজে নতুন রীতি-নীতির প্রবর্তন, জীবনধারণে নতুন উপকরণ সংযোজন এবং মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে ক্রমশঃ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন ইত্যাদি ঘটনা মানব-ইতিহাসের বিরাট এক অধ্যায় জুড়ে বিস্তৃত। সমাজের এই উত্তরণ ও অগ্রগতির পেছনে রয়েছে মানুষের কায়িক শ্রম ও মেধাগত উদ্ভাবনের অবদান, যা প্রধানতঃ কারিগরি ও প্রযুক্তিগত বিকাশের মধ্যেই স্পষ্টতর। আধুনিক সমাজে প্রযুক্তির ব্যাপক ও জটিল প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃত। ইউরোপে নবজাগরণের প্রাক্কালে নিউটনের গতিবিষয়ক সূত্রাবলী আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার অবিস্মরণীয় ত্বরিত বিকাশের পথ সুগম করে দেয়। ফলে মাত্র

চারশো বছরের মধ্যেই যন্ত্রবিজ্ঞান তথা প্রযুক্তি মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় এবং একালের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তার অপরিহার্য প্রভাব আজ সুস্পষ্ট। বিংশ-শতাব্দীর প্রযুক্তি বিকাশের যে দিকটি আজ প্রধান বিষয়ে পরিণত হতে চলেছে তা হলো যন্ত্রবিজ্ঞানের সাথে পদার্থের গঠনগত বিন্যাসের ব্যবহারের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক্স-বিজ্ঞানের সংযুক্তি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটার-এর ব্যাপক ব্যবহার। বস্তুতঃ আধুনিক বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত সাফল্য ও সেই সাফল্যের সর্বব্যাপী প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-সমাজ আজ অনিবার্য কিছু সমস্যা ও জটিলতারও সম্মুখীন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ম্যাক্স ওয়েবার যে বিচ্ছিন্নতাবোধের ইঙ্গিত করেছেন তা এ কারণে যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের কাঠামোগত অপরিহার্যতা হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়, মননশীলতার অভিব্যক্তি হিসেবে নয়। তাই প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার ও সাধারণ মানুষের ধারণাগত উপলব্ধির বিষয়টি যথার্থ অর্থে বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ভূমিকার পরিচয়বহ নয়। ফলে ম্যাক্স ওয়েবার যে বিচ্ছিন্নতাবোধের কথা বলেছেন তার ব্যাপক প্রতিফলন এখন, এমনকি, ব্যক্তিজীবনেও বিশেষভাবে প্রতিফলিত। অন্যদিকে রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যবস্থাপনায় অত্যধিক মনন-নির্ভরতা এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক যান্ত্রিকতার সূচনা করেছে এবং মানবিক সহমর্মিতার পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্বের সংঘাতকেই করে তুলছে মুখ্য। ফলে বাক্য-চমকিত যুক্তির অন্তরালে অমানবিক নিষ্ঠুরতাই অনেক সময় প্রকট হয়ে ওঠে, মানবিক মমত্ববোধ নয়। কিন্তু সমাজ-বাস্তবতার এই বহিরাবরণকে প্রধান বিবেচ্য গণ্য করে এমন আপ্তবাক্য উচ্চারণ নিশ্চয়ই উচিত হবে না যে, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-নির্ভর প্রযুক্তির সর্বব্যাপী ব্যবহারই এর কারণ। কেননা,

বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার ফলাফল কীভাবে পুরোনো সমাজ ব্যবস্থাকে বদলে দেয় তার প্রমাণ ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লব। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল ব্যবহারের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে সভ্যতার নতুন অবয়ব, পরিবর্তিত হয় উৎপাদন পদ্ধতি, উদ্ভাবিত হয় সামরিক প্রযুক্তি এবং সেইসঙ্গে ঘটে অর্থনৈতিক পদ্ধতির রূপান্তর। বৈজ্ঞানিক গবেষণার এই প্রভাবসূচক দিকটির দিকে লক্ষ্য না রাখলে সাধারণ মানুষতো বটেই এমনকি একজন বিজ্ঞানসেবীও নিজের কাজ কিংবা সামগ্রিকভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে সমাজ-প্রগতির সঙ্গে যোগসূত্রহীন মনে করতে পারেন। তাই আমরা যখন বিজ্ঞান-লেখকের সামাজিক ভূমিকার কথা বিবেচনা করি, তখন এ কথাই প্রথমে মনে আসে যে, লেখকের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে সমাজকে বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করা এবং জীবনের সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলা। অবশ্য এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ এমন চিন্তাও করতে পারেন যে, কাউকে একেবারে পৃথকভাবে বিজ্ঞান-লেখক হিসেবে চিহ্নিত করার কোনো প্রয়োজন ছিল কিনা। এই চিন্তা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নয়, কেননা বিজ্ঞান-লেখক নামে অভিহিত করার মধ্যে একজন বিজ্ঞানী বা লেখকের মৌল সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ এখানে হয়তো থেকে যায়। এই নিবন্ধে বিষয়গত বৈশিষ্ট্যের কারণে 'লেখক' শব্দটির সাথে 'বিজ্ঞান' শব্দটি জুড়ে দিয়ে আলোচনার সীমাবদ্ধতাটুকুই কেবল বিনির্দেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, 'বিজ্ঞান-লেখক' নামে নতুন কোনো পৃথক সম্প্রদায় সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়নি। বক্তব্যটি আরো সম্প্রসারিত করে এভাবে বলা যেতে পারে যে, একালে রচনার দিক থেকে বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা একটি পৃথক ধারার দাবিদার, যা বিজ্ঞানের বিষয়গত

ব্যাপ্তির কারণেই বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যসূচক। এ-ধরনের রচনার লেখকদের, কিছুটা সীমিত অর্থে, বিজ্ঞান-লেখক নামে অভিহিত করা তেমন অযৌক্তিক হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের দেশের পাঠকগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে স্যার জেমস জীনস্, আইজ্যাক অ্যাসিমভ, জর্জ গ্যামাও, কার্ল সাগা, জে. বি. এস. হলডেন এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ আল-মুতী, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার প্রমুখের নাম বিজ্ঞান-লেখকের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

তবে বিজ্ঞান লেখকের ভূমিকাটিকে আরো কিছুটা প্রসারিত করে রচনার শ্রেণী-বিভাজন করলে নিম্নোক্ত চারটি শ্রেণীতে বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাবলীকে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) তাত্ত্বিক, (২) তথ্যমূলক, (৩) বর্ণনামূলক, ও (৪) বিশ্লেষণমূলক। অবশ্য এখানে একথাটি সবিনয়ে উল্লেখ করতে চাই যে, রচনার এই শ্রেণী-বিভাজনই এ ধরনের রচনারীতির নিরীক্ষার জন্য কোনো শেষ কথা নয়। এ বিষয়ে অন্য কেউ হয়তো অন্যভাবেও এই শ্রেণীবিন্যাস করতে পারেন, কিম্বা শ্রেণীবিন্যাস না করেও এ ধরনের রচনার মূল্য বিচার করতে পারেন।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর রচনা বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদের নিশ্চয়ই একবার স্মরণ করা উচিত যে, বৈজ্ঞানিক চিন্তার সূত্রপাত পর্যবেক্ষণগত সিদ্ধান্তের যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদানের মধ্য দিয়ে। বস্তু ও বস্তুবিশ্বের গঠন-কাঠামো এবং বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা উদঘাটনের প্রয়াসে প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানীদের মতবাদ পরীক্ষণগত নির্ধারণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিবর্তে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত যৌক্তিকতাকেই অনুসরণ করেছে বেশি। তবে এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানীরা কেবল দার্শনিক ভাবনার অন্তরালেই আত্মগোপন করেছিলেন। আর্কি-

মিডিস-এর পদার্থের আপেক্ষিক ঘনত্ব সম্পর্কিত আবিষ্কারটি আমাদের এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, পরীক্ষণগত নির্ধারণ পদ্ধতিও তাঁদের বিজ্ঞান-ভাবনার অন্তর্গত ছিল। কিন্তু তা ছিল মূলতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সংখ্যা-সম্পৃক্ত ভাবনামূলক। গ্রীক নগর রাষ্ট্রসমূহের পার্থিব সমৃদ্ধি এবং নতুন উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনই ছিল গ্রীকদের যন্ত্রবিদ্যায় দক্ষতা অর্জনের অপরিহার্য কারণ। আর এই দক্ষতার উপজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরম্পরাগত বিজ্ঞান-চিন্তা। সম্ভবতঃ সে কারণেই মধ্যযুগে গ্রীক বিজ্ঞানের পুনরাবিষ্কার ও পুনর্গঠনের প্রয়াস ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উপরিউক্ত পুনরাবিষ্কার আমাদের আলোচনার জন্য সহায়ক হতে পারে এ কারণে যে, প্রাচীন গ্রীক রচনার বৈজ্ঞানিক ধারাকে যদি আমরা তাত্ত্বিক রচনার একটি রূপ বলে ধরে নেই, তাহলে এ কালের তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক রচনার সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব। এ কালের তাত্ত্বিক রচনা মূলতঃ বৈজ্ঞানিক চিন্তা, গবেষণা বা উদ্ভাবন-প্রক্রিয়ার ভাষারূপ মাত্র। এ ধরনের রচনা প্রকৃতপক্ষে শুধু সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অবহিত বিজ্ঞানী অথবা বিজ্ঞান-কর্মীদের উদ্দেশ্যেই রচিত। বলাবাহুল্য আধুনিক বিজ্ঞানের বহুল-বিস্তৃতির কারণে একালে যে কারও বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রসমূহ হয়ে পড়ে বিশেষ ভাবে বিনির্দেশিত, প্রাচীন ও মধ্যযুগের মিশ্রবিজ্ঞানের ঐতিহ্য আর অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। ফলে সমাজের বৃহত্তর সাধারণ পাঠকগোষ্ঠীর কাছে তাত্ত্বিক রচনার আবেদন একান্তভাবে সীমিত। এদিক থেকে দেখা হলে, যে কেউ ধরে নিতে পারেন যে, তাত্ত্বিক রচনার কোনো সামাজিক প্রভাব নেই। কিন্তু পরোক্ষ ভাবে তাত্ত্বিক রচনাসমূহ যেহেতু বিজ্ঞান-কর্মের ক্রমাগ্রগতির সেতুবন্ধ, সেহেতু উত্তরকালে তা নতুন চিন্তার সূত্র নির্দেশ করে এবং, এমনকি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বিশেষ গবেষণার দিগ-

নির্দেশক প্রেরণা-উৎসও হয়ে উঠতে পারে। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাত্ত্বিক রচনার ভাবনাসূত্র কিংবা নেহাৎই প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থেকে উত্তরকালে উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন বা আবিষ্কার সম্ভব হওয়ার একাধিক কাহিনীই বিদ্যমান। মনে রাখা প্রয়োজন, এসব ঘটনা বিজ্ঞানের ইতিহাসের ঐতিহ্যবোধের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আপাতদৃষ্টিতে কাকতালীয় মনে হলেও গভীর বিশ্লেষণের নিরিখে তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পরম্পরাগত সম্পর্কের অন্তর্নিহিত সম্পর্কের প্রমাণও বটে।

আমরা জানি, একালে একাডেমিক বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গবেষণাপত্র প্রকাশ একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে। বিষয়গত সুনির্দিষ্টতার মধ্যে সীমিত বলেই এসব গবেষণাপত্রে তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ ও বিষয় সম্পর্কিত পরীক্ষণগত উপাত্তই অধিক গুরুত্ব লাভ করে। তাই ব্যাপক অর্থে, গবেষণাপত্র রচয়িতাদের বিজ্ঞান-লেখক বলার অবকাশ নাও থাকতে পারে, যেহেতু রচনাটি তাঁদের কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাত্ত্বিক বক্তব্যটি যখন বিষয়গত উদ্দেশ্যের খণ্ডিত ভূমিকা অতিক্রম করে তখন এই রচনাটিই বিজ্ঞানের দার্শনিক প্রতীতি অর্জন করে। বলা বাহুল্য, আইনস্টাইনের 'আপেক্ষিকতাবাদ' এই শ্রেণীর রচনার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, কিন্তু একমাত্র নয়। এ প্রসঙ্গে যোহান গ্রেগর মেণ্ডেলের বংশানুস্থৃতি সম্পর্কিত পরীক্ষা ও প্রবন্ধের কথা স্মরণ করা যেতে পারে, যা তাঁর মৃত্যুর ষোল বছর পর পুনরাবিষ্কৃত হয় এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসে 'মেণ্ডেলবাদ'-এর নবমূল্যায়ন ঘটে। ষোড়শ শতকে কপার্নিকাস-এর 'নভোবস্তুসমূহের পরিভ্রমণ সম্বন্ধে' এবং সপ্তদশ শতকে 'গ্যালিলিও'র 'দুই প্রধান বিশ্বপদ্ধতি সম্পর্কিত সংলাপ টলেমীয় ও কপার্নিকান' গ্রন্থদ্বয়ের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা বিস্মৃত হওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বৈজ্ঞানিক রচনার দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত তথ্যমূলক রচনা মূলতঃ বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট প্রতিভাসের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা মাত্র। পরম্পরাগত তাত্ত্বিক বিকাশের জটিলতা পরিহার করে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিজ্ঞান-ভাবনাকে উদ্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীর নিকট উপস্থাপনের উপায় হিসেবে এই রচনারীতি পাঠ্যপুস্তকে এবং পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক রচনায় অনুসৃত। এধরনের রচনার বিস্তৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা সীমিত হতে বাধ্য, কেননা তাত্ত্বিক রচনার সামগ্রিকতার আবহ যেমন এধরনের রচনায় অনুপস্থিত তেমনি বর্ণনামূলক রচনার সহজবোধ্যতাও এতে থাকে না। ফলে, তথ্যমূলক রচনার চরিত্রে সাময়িকতার প্রাধান্যই প্রকট এবং এই শ্রেণীর রচনার লেখককে, প্রকৃত অর্থে, বিজ্ঞান-লেখক হিসেবে গ্রহণ করা কঠিন। অন্যদিকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত বর্ণনামূলক রচনাই এখনো আমাদের দেশের পাঠকগোষ্ঠীর নিকট অধিকতর সমাদৃত। প্রধানত পরিচয় প্রদান ও প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত এই বর্ণনামূলক রচনা বিজ্ঞানের ভাবগত চরিত্র তুলে ধরার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োগ অথবা সাধারণের পক্ষে বিস্ময়সূচক বৈজ্ঞানিক তথ্য উপস্থাপনের ভূমিকাই পালন করে বেশি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তির ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ধারণা ও আগ্রহ সৃষ্টির পক্ষে এই শ্রেণীভূক্ত রচনার কার্যকারিতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু একই সঙ্গে বর্ণনামূলক রচনার সীমাবদ্ধতার কথাটিও এক্ষেত্রে বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সীমাবদ্ধতা এ কারণে যে, এই শ্রেণীভুক্ত রচনা মূলতঃ বিষয়গত এবং পাঠকমুখী। তাই বিষয়ের সাম্প্রতিকতাকে অতিক্রম করে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনার ভাবগত সমগ্রতাকে ধারণ করার সুযোগ এখানে মোটামুটিভাবে অনুপস্থিত। এছাড়া, প্রধানতঃ পাঠকের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখা হয় বলেই ব্যাপক তাত্ত্বিক আলোচনা এরূপ রচনার জন্য অনুপযোগী হতে বাধ্য। উপরন্তু বর্ণনামূলক

রচনার মধ্যে, কিছুটা হলেও সমসাময়িকতার প্রাধান্য থাকে, কারণ বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু নাটকীয় ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের প্রবণতা এ ধরনের রচনার চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে—লেখককে এ কথাটি অবশ্যই মনে রাখতে হয়। অতএব বর্ণনামূলক রচনার সামাজিক ভূমিকা মূলত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে পরিপূরক ভূমিকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারে সাহায্য করা। তাই বর্ণনা-মূলক রচনার ক্ষেত্রে লেখককে যেমন বিষয় উপস্থাপনে সতর্ক থাকতে হয়, তেমনি ভাষা ব্যবহারেও থাকতে হয় সচেতন। বলাবাহুল্য এ ধরনের রচনা-রীতি আপাতঃদৃষ্টিতে সহজ ও সরল, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন—তাতে পারঙ্গমতা আয়ত্ত করা কত কঠিন। শিক্ষার প্রসার ও বিশ্ববিজ্ঞানের পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক রচনার ভূমিকা যে কোনো সমাজে ব্যাপক, বিশেষত বাংলাদেশের মতো উন্নয়নগামী দেশসমূহে। প্রস্তাবিত চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত বিশ্লেষণমূলক বৈজ্ঞানিক রচনা বলতে আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং ইতিহাসে সে গবেষণার গুরুত্ব নির্ণয়মূলক রচনা বুঝে থাকি। বলা বাহুল্য, বিশ্লেষণধর্মী রচনার মধ্যেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সমাজ প্রগতির মধ্যেকার অন্তর্নিহিত সম্পর্কের প্রকৃতি অনুসন্ধানের প্রয়াস সম্ভব। বস্তুত বিশ্বজগতের ক্রমপ্রকাশমান শৃংখলা-পদ্ধতির উৎস-চিত্র অনুধাবনের সর্বোত্তম মাধ্যমই হচ্ছে বিশ্লেষণধর্মী রচনা। এই প্রকৃতির রচনা তাই কেবল তত্ত্ব ও তথ্য কিংবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বর্ণনামূলক কাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বিশ্ব-নক্শার দার্শনিক চিত্রটি উপস্থাপিত করারও চেষ্টা করে। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান-লেখকের সামাজিক ভূমিকার বিষয়টি এক কথায় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। বস্তুত বিজ্ঞান-লেখকের সামাজিক ভূমিকা নির্ধারণের পূর্বে যে সমাজের জন্য ভূমিকার প্রশ্নটি বিবেচিত হবে সেই সমাজের

প্রকৃত চিত্রটি কেমন তা জানা প্রয়োজন। এখানে এ কথাটিও বলে নেয়া দরকার যে, বিজ্ঞান বা শিল্পসাহিত্যের সামাজিক উপযোগিতার বিষয়টি নির্ধারিত মাত্রাবিচারের সরলরেখায় বিচার করা চলে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিজ্ঞানকে সামাজিক উপযোগিতা তথা শিল্পোৎপাদন বা স্বাচ্ছন্দ্য উপকরণের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে চিহ্নিত করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়েছে, সম্ভবত, টেকনোলজি বা প্রযুক্তির পোশাকে আবৃত করে এক ধরনের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মধ্যে বিজ্ঞানকে আবদ্ধ করার প্রয়াস থেকেই। কিন্তু বিজ্ঞান শুধু স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ নির্মাণের হাতিয়ার কিংবা বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির জীয়নকাঠি নয়। বরং বিজ্ঞানের প্রকৃত মহত্ত্ব নিহিত মানুষের মননশীলতাকে মানবিক অন্বিষ্টের দিকে চালিত করার প্রেরণা সৃষ্টির মধ্যেই। পক্ষান্তরে একথাও সত্য যে, মানুষ সামাজিক জীব এবং বিজ্ঞান মানুষেরই সৃষ্টি। তাই সমাজ যে বিজ্ঞান কামনা ও ধারণ করে—বিজ্ঞানের প্রসারও ঘটে ঠিক ততখানি, তার বেশি নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, বিজ্ঞান নিজে প্রযুক্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, কিন্তু প্রযুক্তির বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা আবিষ্কারের অনেক আগেও বিভিন্ন সময়ে উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োজনেই যান্ত্রিক কুশলতা উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত একালে একজন বিজ্ঞান-লেখকের সামাজিক ভূমিকা তাই একদিকে যেমন সমাজকে বিশ্ব বিজ্ঞানের স্তরসমূহ ও সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক প্রয়াস সম্পর্কে অবহিত রাখা, তেমনি অন্যদিকে সমাজে বিজ্ঞানের জন্য উপযুক্ত চাহিদা সৃষ্টি করা। তবে 'বিজ্ঞানের জন্য উপযুক্ত চাহিদা' কথাটি হয়তো কারো কারো কাছে দ্ব্যর্থবোধক মনে হতে পারে, যেহেতু আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তা অনেক সময় অভিন্ন বলে ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সমাজ-বিবর্তনের ধারার দিকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকানো

গেলে বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, সমাজের আর্থসামাজিক উপরিকাঠামো যে গতিতে পরিবর্তিত হয়, মননগত নববিন্যাস তদনুরূপ দ্রুততার সাথে ঘটে না। ফলে বিশেষভাবে বিজ্ঞান-লেখকের দায়িত্বটি এ যুগে অনেক বেশি সচেতনতার দাবী রাখে, যেহেতু প্রাগ্রসর কিংবা অনগ্রসর উভয়বিধ সমাজ-মানসেই বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও তত্ত্বীয় ধারণাসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনের ব্যাপ্তি নেহাতই সীমিত। যথার্থ অর্থে সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য একজন বিজ্ঞান-লেখকের ভূমিকা হবে একই সঙ্গে উপস্থাপক ও বিশ্লেষকের। তাঁকে যেমন বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করতে হবে, তেমনি তা উপস্থাপনের রীতি-পদ্ধতিও নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক দায়িত্ব পালনে শিক্ষা-ব্যবস্থার কার্যত স্থবির ভূমিকার কথাটি এ প্রসঙ্গে বিবেচনার যোগ্য। শিক্ষা-সংস্কার বিষয়ক একাধিক কার্যক্রম সম্ভবত এই স্থবিরতা অপসারণের উদ্দেশ্যেই। কিন্তু বাস্তবে এসব কার্যক্রম যে ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ, সে কথাটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে প্রায়শ:ই স্বীকার করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে পরীক্ষা-পদ্ধতির ব্যর্থতাই একমাত্র বিচার্য বিষয় নয়। এ বিষয়ে কেউ কেউ সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিষয়টি উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারবেন না, তা জানি। তবে সাধারণভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার শিক্ষায়তনিক দিকটির কথা চিন্তা করলে আমরা দেখি, উপযুক্ত জনশক্তি ও উপকরণের অভাব বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসারের শ্লথগতির জন্য প্রধানত দায়ী। ফলে অতি নগণ্য সাক্ষরতা-হারবিশিষ্ট এই দেশটিতে বিজ্ঞান-শিক্ষার ভূমিকাটি, যথার্থ অর্থে তেমন প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি। এ কারণেই বিজ্ঞান-শিক্ষার একাডেমিক উদ্যোগ দীর্ঘকাল পরেও মৌল বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একটি প্রবল ধারা হয়ে উঠতে পেরেছে বলে দাবি করা কঠিন।

এই অবস্থায় এদেশে একজন বিজ্ঞান-লেখকের প্রাথমিক ভূমিকাটি হওয়া উচিত ম্যাজিক-ধারণার পরিবর্তে বিজ্ঞানের মৌলিক পরিচয়টি সুস্পষ্ট করে তোলা। সঙ্গত কারণেই এই পর্যায়ে বর্ণনামূলক রচনার প্রভাবই অধিক হতে বাধ্য। আর সমাজের শিক্ষানুরাগী শ্রেণীর মধ্যে এই শ্রেণীর রচনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিও হয় সবচেয়ে বেশি। তবে এই আগ্রহের পেছনে একাডেমিক উৎকর্ষ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা যতখানি, ততখানি শুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চার প্রতি নয়।

এই ধরনের সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে একজন বিজ্ঞান-লেখকের ভূমিকা আদৌ কোনো সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি করে কিনা তা অবশ্যই আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তবে, সাধারণভাবে বিজ্ঞানচর্চায় অগ্রসর দেশসমূহের সঙ্গে অনগ্রসর দেশসমূহের সমাজ বাস্তবতার কোনো সমান্তরাল সম্পর্ক আবিষ্কার অসম্ভব বলেই মনে হয়। সে কারণেই অনগ্রসর বা উন্নয়নগামী তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে পাশ্চাত্যের 'পপুলার সায়েন্স' ঠিক সহজবোধ্য বা পপুলার বিবেচিত হতে পারে না, এমনকি দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার পরও নয়। অতএব বাংলাদেশের মতো উন্নয়নগামী দেশসমূহে বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বসমূহ এবং বিশেষভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস সাধারণ পাঠকগোষ্ঠীর পাঠযোগ্য করে উপস্থাপনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কেননা, আধুনিক বিজ্ঞানের মৌলিক আবিষ্কারসমূহে পৌঁছার লক্ষ্যে মানুষকে কি ধরনের অভিজ্ঞতা ও প্রয়াসের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে তার পরিচয় লাভের জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ একটি অপরিহার্য শর্ত। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে আলোচনা ও পঠন-পাঠন শিক্ষায়তনিক সীমাবদ্ধতার বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করে এবং আগ্রহী পাঠকের মনে, কিছুটা হলেও, বিজ্ঞান-শৃঙ্খলার স্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরতে পারে। বলা বাহুল্য বিজ্ঞান কি এবং আধুনিক বিজ্ঞান

কীভাবে ইতিহাসের পর্যায়সমূহ অতিক্রম করেছে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন ব্যতীত বিজ্ঞানচর্চার স্বরূপ উদঘাটন অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে লেখকের যে সচেতনতা কাম্য তা হলো—পাঠকের মনন-পর্যায় ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপায়ে রচনা উপস্থাপন। তবে লেখকভেদে এই উপস্থাপন রীতি ভিন্ন হতে বাধ্য—সে কথা অস্বীকার করা যায় না এবং সে কারণেই রচনারীতির কোনো পদ্ধতি বিনির্দেশিত করার সুযোগও এখানে নেই। তবে একথা সত্য যে, প্রকৃত অর্থে ইতিবাচক সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজন লেখক নিজে যে সমাজের মানুষ, সেই সমাজের বাস্তব প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত থাকা। মূলতঃ একজন সচেতন বিজ্ঞান-লেখক নিজেই সনাক্ত করতে সমর্থ, তাঁর সমাজের পাঠকগোষ্ঠীর জন্য কি প্রয়োজন। এই প্রয়োজনই নির্ধারণ করে কোন শ্রেণীর রচনা তাঁর সমাজের জন্য কতখানি আবশ্যক। দ্বিতীয়ত, রচনার শ্রেণীবিভাজনের সাথে সাযুজ্য রক্ষা করে রচনার ভাষা নির্ধারণের দায়িত্বও লেখকেরই। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে বিজ্ঞানবিষয়ক পরিকল্পিত রচনা, খুব পরোক্ষে হলেও, মোটামুটি ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হতে পারে। তাই সচেতন সামাজিক ভূমিকা পালনের স্বার্থে বিজ্ঞান ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের দিকটি অবশ্যই অন্যতম প্রধান বিবেচ্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এই দায়িত্ব লেখকের মনন ও বোধ-নির্ভর, কেননা বিজ্ঞানের মূল ভূমিকা বস্তুত বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা উদঘাটন এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের তথা সমাজমানসের মননশীলতার ইতিবাচক উত্তরণ সৃষ্টি। এই উত্তরণ ব্যতীত বিজ্ঞান চর্চার সামগ্রিক ভূমিকাই 'সিসিফাস'-এর ব্যর্থ শ্রম বলে মনে হতে পারে—এ কথাটি বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞান-লেখক কারুরই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

বিজ্ঞানচর্চা : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা একালে যে কোনো দেশ বা জাতির জন্য একান্ত অপরিহার্য—এ কথা নিয়ে মতদ্বৈধতার কোনো অবকাশ নেই। আধুনিক বিজ্ঞান এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি নৈপুণ্য আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ধারণের সাথে নানাভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সাহচর্য বা নির্ভরতা কেবল যে বস্তুগত তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে তা আমাদের মানস-গঠনের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট, যদিও শিথিল চিন্তায় এই বক্তব্যটি সূক্ষ্মভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না হয়তো। ফলে বিজ্ঞানচর্চার যে ভূমিকা সমাজে ব্যাপকভাবে অনুভূত হওয়া উচিত, তা প্রকৃতপক্ষে অন্তরালেই থেকে যায়। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তিবিদ্যার যথাযথ প্রয়োগের বিষয়টি নীতিগত-ভাবে সর্বজনস্বীকৃত ; কিন্তু নীতিগত স্বীকৃতির পরবর্তী স্তর তথা বাস্তবায়ন পর্যায়সমূহে কি পরিকল্পনা গৃহীত হবে অথবা কীভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে দেশ ও সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জীবনমান উন্নয়নের জন্য যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হবে—সে বিষয়টি অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষা পরিকল্পনাকারীদের জরুরী বিচার্য বিষয়। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানশিক্ষা যুগোপযোগী করা এবং বিজ্ঞান-চর্চার সুযোগ ব্যাপকভাবে লভ্য করা ইত্যাদি সমস্যা মূলত বিশেষজ্ঞদের নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন করে। এ সব প্রশ্নের মধ্যে একটি বড় প্রশ্ন হলো—মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা। চরিত্রগত কারণেই বিজ্ঞান আন্তর্জাতিক। বিজ্ঞানের আবিষ্কার কোনো বিশেষ দেশ

বা জনগোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট কোনো আবিষ্কার নয়। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনও অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক, এবং বিশেষভাবে একালে সহজ পরিবহণ ও যোগাযোগ-মাধ্যম তথা বিশ্বব্যাপী সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টির কারণে প্রযুক্তির প্রায়োগিক অর্জন অতি দ্রুত এক দেশ থেকে অন্য দেশে হস্তান্তরিত হতে পারে। এর ফলে জীবনমানের দিক থেকে অতি নিম্ন পর্যায়ে অবস্থানকারী দেশের অধিবাসীরাও দ্রুত উন্নত ও শিল্পসমৃদ্ধ দেশসমূহের প্রযুক্তি-প্রসূত স্বাচ্ছন্দ্য বা বিনোদন সুযোগ নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গীভূত করার সুযোগ লাভ করে। অবশ্য বাস্তবে যা ঘটে, তা হলো, উন্নয়নশীল দেশসমূহের জনগণের এক অতি ক্ষুদ্র অংশই মাত্র এই স্বাচ্ছন্দ্য বা সুযোগের অধিকারী হয় এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের জীবন ধারণের রীতির ব্যবধান আরো সম্প্রসারিত হতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই ব্যবধান প্রধানতঃ আর্থ-সামাজিক কারণে সৃষ্ট—এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা ধরে নিতে পারি যে, জীবনযাপনগত এই ব্যবধান সত্ত্বেও সার্বিকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিপ্রসূত চমৎকারিত্ব বা অবকাঠামোগত পরিপার্শ্ব বিশেষভাবেই সমগ্র জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। এবং এই প্রভাবের কারণেই, নিদেন পক্ষে সংরক্ষণধর্মী প্রয়োজনে হলেও, প্রযুক্তির কারিগরি অভিজ্ঞতাটুকু আয়ত্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এভাবেই আমদানীকৃত প্রযুক্তির সাথে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পরিচয় ঘটে। কিন্তু সে পরিচয় কেবল বহিরাবরণ-তথ্যেই সীমিত থাকতে বাধ্য হয়। এখানেই প্রশ্ন দেখা দেয়—বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সমকালীনতা অর্জনে মৌল বিজ্ঞানের চর্চা একান্ত আবশ্যক, অথবা আমদানীকৃত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্ববিজ্ঞানের প্রায়োগিক সন্তুষ্টির মধ্যেই আত্মনিবিষ্ট থাকা প্রয়োজন।

প্রাসঙ্গিক যুক্তিসমূহের দিকে তাকালে আমরা ভাবতে পারি, প্রাগ্রসর দেশসমূহের মৌলবিজ্ঞান এতো বেশি অগ্রসর যে, সীমিত সম্পদ ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে এই অনুসরণ হয়তো চিরকালই নিতান্ত অনুগামিতা রূপেই চিহ্নিত হবে এবং লক্ষ্য ও অর্জনের ব্যবধান নিয়ত দুরতিক্রম্য হতে থাকবে। পক্ষান্তরে সংগৃহীত প্রযুক্তি-নির্ভরতার মাধ্যমে অন্তত প্রযুক্তিগত ধ্যান-ধারণার সাথে সম্যক পরিচয় ঘটতে পারে। এবং প্রয়োগের মাধ্যমে তার সুফল ভোগ করার অধিকার সকলেরই রয়েছে। এর পাল্টা যুক্তিও অবশ্যই রয়েছে এবং সে যুক্তির উৎসাহী সমর্থকের সংখ্যাও কম নয়। আমাদের আলোচনায়, সঙ্গত কারণেই, আমরা এই বিতর্কে প্রবেশ করতে অনুৎসাহী, কেননা এই বিতর্কের সম্মত সিদ্ধান্ত আমাদের আলোচনার লক্ষ্য নয়।

মানবেতিহাসে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্রমবিবর্তনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই—সর্বকালে বিজ্ঞানচর্চায় দু'টি ধারা কমবেশি স্পষ্ট ছিল। এ দু'টি ধারার একটি হচ্ছে ভাববাদী এবং অপরটি বস্তুবাদী। ভাববাদী চিন্তাধারায় বিজ্ঞানকে সর্বজনীন শৃঙ্খলার আবশ্যিক বা প্রতীকী প্রকাশরূপে চিত্রিত করার চেষ্টা হয়েছে। অন্যদিকে, বস্তুবাদী চিন্তাধারায় বস্তুগত শৃঙ্খলাতত্ত্ব আবিষ্কারের পরিবর্তে বস্তুগত সত্য উদ্ভাবনের প্রয়াসই অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। বিজ্ঞানচর্চার দার্শনিক প্রতীতি সন্ধানীর কাছে এই দ্বিবিধ প্রকরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গুরুত্ববহ, নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় আরো সরল ও প্রত্যক্ষ। আমাদের আলোচনায় একালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সার্বিক পরিচয় সম্ভব করার জন্যে মাতৃভাষার ব্যবহার এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান-শিক্ষার রীতি প্রকরণের চেয়ে বিজ্ঞানচর্চার অনুষঙ্গই প্রাধান্য পাবে বলে আমরা আশা করি।

২.

বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে মানব সভ্যতার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করলে আমরা মানুষের জীবনযাত্রার প্রকরণগত উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ প্রগতির পরিচয়টুকু চিহ্নিত করতে পারি। মানব সমাজের যে নির্ণীত নিয়মিত ইতিহাস আমরা পাই তাতে দেখি— খ্রীষ্টপূর্ব ২০,০০০ বছর থেকে তার শুরু। এই সময়টি প্রাচীন প্রস্তরযুগ নামে পরিচিত, যখন সূচিত হচ্ছে মানুষের উদ্ভাবন প্রয়াস। তখনই আত্মরক্ষা ও আহার্য সংগ্রহের জন্য মানুষ তার মেধা ও শ্রমকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এই পর্যায় থেকেই শ্রম ও মননচর্চা মানুষের বৈশিষ্ট্য তৈরি করতে শুরু করে। তবে একথা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রাচীন প্রস্তরযুগে মানুষ জগৎ ও জীবনের উপর কোনো দৈবশক্তির প্রভাব বিষয়ে অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে নি কিংবা বিশ্বকাঠামোর রূপরেখা নির্মাণের আত্যন্তিক প্রয়োজনও তারা অনুভব করে নি। এরপর, আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ১০,০০০ বছর থেকেই পৃথিবীতে নতুন প্রস্তরযুগের শুরু। প্রাচীন প্রস্তরযুগ থেকে নতুন প্রস্তরযুগের তফাত শুধু হাতিয়ার নির্মাণের দক্ষতা ও কারিগরি কুশলতা অর্জনেই সীমিত ছিল না, বরং নিছক পশুশিকার থেকে তাদের উত্তরণ ঘটলো পশুপালনেও। এটি ছিল মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যুথবদ্ধ সমাজ বা ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ অর্জনের সূচনাকাল, যদিও ব্যক্তিগত সম্পদ বলে চিহ্নিত করার মতো তখনো তেমন কিছুই ছিল না। অন্যদিকে, প্রযুক্তি কৌশলের উন্নয়নের ফলে মানুষের মনে এই ধারণা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হলো যে, মেধা, শ্রম ও বারংবার প্রয়াসের মাধ্যমে নতুন হাতিয়ার কিংবা সামগ্রী তৈরির কৌশল আয়ত্ত করা সম্ভব। এই পর্যায়টিই ছিল মানুষের সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার শুভ মুহূর্ত, আত্মশক্তি সম্পর্কে আস্থা অর্জনের সময়। বস্তুতঃ পরবর্তীকালের মানবেতিহাসের দিকে

তাকালে আমরা বুঝতে পারি-নিজের শক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভের পর থেকেই মানুষ দ্রুত তার জীবনোপকরণ পরিবর্তনে প্রয়াসী হয়েছে, উৎপাদন-প্রক্রিয়া আবিষ্কার ও উন্নয়নে হয়েছে ব্রতী। প্রাচীন প্রস্তরযুগ ও নতুন প্রস্তরযুগের মধ্যে গুণগত পার্থক্য তাই কেবল কারিগরি কুশলতার অগ্রগমন নয়, বরং শিকারজীবী জীবনে পশুপালনের সংযোজনই প্রধান। সম্ভবতঃ এর ফলেই মাত্র চার হাজার বছর পর অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব ৬,০০০ বছর থেকে মানুষ ফসল ফলানোর কৌশল আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো। স্পষ্টতঃই শিকারজীবী মানুষের কৃষিজীবী মানুষে রূপান্তর মানবেতিহাসের এক বড় ঘটনা। শিকারের পশু খোঁজার জন্য মানুষকে আবহাওয়ার উপর আর তেমন নির্ভর করতে হয় না। কিন্তু কৃষিকাজের প্রয়োজনেই মানুষ আবহাওয়ার হদিশ নিতে বাধ্য হলো চিহ্নিত করতে শিখলো ঋতুর পরিবর্তন। প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের প্রথম সার্থক সূচনা মানুষের এই বাঁচার তাগিদেই। বস্তু ও প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমেই এভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সূচিত হয় মানুষের মনে। সেই সাথে সূচিত হয় কর্মভিত্তিক শ্রেণী বিভাজন। কিন্তু সে প্রসঙ্গটি আপাতত আমাদের প্রত্যক্ষ বিচার্য বিষয় নয়। ঋতু-পরিবর্তনের বিষয়টি মূলত পর্যবেক্ষণ দ্বারাই করা সম্ভব। অন্যদিকে কৃষিকাজের প্রয়োজনে নির্মিত হতে লাগলো নানা রকম সরঞ্জাম। একালের দৃষ্টিতে আদিম কৃষি-যন্ত্রপাতির প্রযুক্তি-কৌশল যত সরলই হোক না কেন, মানবজাতির সে সময়কার জীবনপ্রণালীর প্রেক্ষাপটে এই উদ্ভাবনের তাৎপর্য ছিল প্রকৃতই সুদূরপ্রসারী। ব্যবহারের উপযোগিতার মাধ্যমে হাতিয়ার ও সরঞ্জামের আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে ক্রমে ক্রমে। তেমনি আবহাওয়াগত পর্যবেক্ষণের তাগিদেই আকাশের তারকারাজির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে মানুষ। এ কারণে জ্যোতির্বিদ্যাই হচ্ছে

সম্ভবত মানুষের মৌলবিজ্ঞান চর্চার প্রথম বিষয়। 'কৃষিযুগের সময় থেকেই চিহ্নিত লিখিত চিত্রিত দলিলপত্র চুক্তিপত্র পাঁজির হিসাব শিলালিপি এসবও মোটামুটি নিয়মিতভাবে রয়ে গেছে। সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে সংখ্যা ও অক্ষর আবিষ্কারের অবদান ছিল প্রচুর। অক্ষরের উন্নতি শুধু ভাষা নয় গণনাবিদ্যাকেও এগিয়ে দিয়েছিল। ব্যবসা এবং অর্থনীতিরও উন্নতি হতে লাগল। ওজন ও মুদ্রার নির্দিষ্ট একক দেখা দিল। অর্থবিনিময় বস্তুবিনিময়ের চলন হল। ধাতু—তামা ও ব্রোঞ্জ আবিষ্কৃত ও তার ব্যবহার হতে লাগল। পশুশক্তির এবং চাকা লাঙল ও কাস্তের ব্যবহার শুরু হল। চাকার আবিষ্কার প্রযুক্তিকৌশলে বলা যায় বিপ্লব এনেছিল। মাটির বাসন তৈরির কাজও চাকার ব্যবহারে সহজ হল। ক্রমে চাষীদের পঞ্জিকার দরকার হয়ে পড়ল, ব্যবসায়ীরা শিখল সমুদ্র-যাত্রা করতে। উভয়ের জন্যই জ্যোতিষশাস্ত্রে অনুশীলনের প্রয়োজন বাড়ল। এই সময় থেকেই সংখ্যার দিকে বিশুদ্ধ আকর্ষণ দেখা দিল জন্ম হল বিমূর্ত সংখ্যার। ভগ্নাংশ এল। সূচক। সভ্যতায় সভ্যতায় সংযোগে ও বিনিময়ে ভাবনা ও জ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটল। বসতির স্থানান্তর ও ব্যবসায়ীদের ভ্রমণ, এই ছিল সংযোগের মূলধারা।' [১]

প্রধানত এ কারণেই খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ বছর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতাসমূহের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এসব প্রাচীন সভ্যতার মূল জীবিকাশক্তি কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা হলেও দেশ ও অঞ্চল ভেদে কিছু মৌলিক পার্থক্যও তাতে দেখা দিয়েছিল। প্রযুক্তিকৌশলের মধ্যেও ছিল গুণগত পার্থক্য এবং অর্জিত নৈপুণ্যের মধ্যেও ছিল ভিন্নতা। কিন্তু মোটামুটিভাবে মানবসভ্যতার এই পর্যায়টিকে আমরা আদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চার সূচনাপর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। পরবর্তীকালে এসব সমাজব্যবস্থা ও সভ্যতার

অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, অধিকতর শক্তিশালী মানবগোষ্ঠীর আক্রমণ, ইতিহাসের অমোঘ পরিবর্তনশীলতা ইত্যাদি কারণে প্রাচীন সভ্যতাগুলোর প্রায় সব ক'টিই ক্রমে ক্রমে নির্জীব ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মানবেতিহাসের পরম্পরাগত ঐতিহ্যবোধ অবিচ্ছিন্ন থেকে যাওয়ার কারণেই উপর্যুক্ত আদি সভ্যতার অর্জিত প্রযুক্তিকৌশল ও জ্ঞানচর্চার সার্বিক পুনর্গঠন, আংশিকভাবে হলেও, একালে সম্ভব হয়েছে। মিশরীয় সভ্যতার জ্যামিতিক অবদান, নির্মাণকৌশল ও সেচ-প্রণালী যেমন আমাদের জিজ্ঞাসার অঙ্গীভূত হয়েছে, তেমনি আসিরীয়দের গণনাপদ্ধতি ও লিখনরীতির বিষয়টিও আমরা অবগত হতে পেরেছি। জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ও ভেষজবিজ্ঞানে ভারতীয়দের উৎকর্ষের কাহিনী যেমন আমাদের অবিদিত থাকে না, তেমনি গ্রীকদের বিস্ময়করভাবে সুসংবদ্ধ বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার বিষয়টিও আমরা মোটামুটি অবিকৃতভাবেই সনাক্ত করতে সমর্থ হই। লিখনরীতি তথা ভাষাই বহু হাজার বছরের চিন্তা ও ভাবনা-রীতিকে আমাদের বোধগম্য করে তুলেছে—এ কথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

৩.

মানুষের লিখিত ভাষার মধ্য দিয়েই এক অঞ্চলের বিজ্ঞান চর্চার বিবরণ অন্য অঞ্চলে পৌঁছেছে। সে বিবরণ যেখানে অসম্পূর্ণ সেখানে অঞ্চলবিশেষ বা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বিজ্ঞান-ভাবনার পরিচয়ও খণ্ডিতভাবেই পাওয়া গেছে। আদি বিজ্ঞান-ভাবনার লিখিত রূপের মধ্যে গ্রীসদেশের বিজ্ঞানীদের ভাবনা ও যুক্তিনিঃসৃত ধারণার পরিচয়ই পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো—বস্তুর ধর্ম নয়, বরং বস্তুবিশ্বের সর্বজনীন ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রয়াসই ছিল আদি-বিজ্ঞানের প্রধান প্রয়াস। যেমন—'দক্ষিণ ইটালীর আয়োনীয় উপনিবেশ ইলিয়ার অধিবাসী ছিলেন পার্মেনিডস। 'সত্যের পথ' গ্রন্থে তিনি লিখলেন যে, 'বিশ্বকে বুঝতে

হলে চিন্তা করতে হবে বস্তু কি এবং বস্তু কি নয়। কিন্তু বস্তু কি নয় এ প্রশ্ন অর্থহীন, কেননা তা কিছুই নয়। শুধু 'যা কিছু' তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বা অংশত 'যা কিছু নয়' তা থাকতে পারে না। অতএব কোথাও খালি জায়গা বা শূন্য স্থান থাকতে পারে না। 'যা কিছু' তা দিয়ে বিশ্ব এবং তাই হলো বস্তু। অদ্বৈতবাদই যথার্থ, কেননা বিশ্ব একক এবং সুষম, যার প্রতিটি অংশ অন্য অংশের মতোই। বিশ্ব সম্পূর্ণরূপে পদার্থ দিয়ে পরিপূর্ণ স্থান বা প্লেনাম যেখানে কোনো খালি জায়গা নেই। বিশ্ব অবিভাজ্য, কেননা সেখানে এমন কোনো ফাটল নেই যেখানে ছুরি ঢুকিয়ে এই পরম অবিচ্ছিন্নতাকে বিভক্ত করা যায়। তাই বিশ্বে কোন গতিও সম্ভব নয়, কেননা এমন কোন শূন্য স্থান নেই যেখানে বস্তু যেতে পারে।' [২]

উপরের উদ্ধৃতিটুকু বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বা অনুসন্ধান প্রসূত উপসংহার নয়। এ হচ্ছে দার্শনিক যুক্তিবিদ্যার আলোকে বস্তু-জগতের বাস্তব ধর্মাবলী অস্বীকার করার প্রয়াস মাত্র যদিও বিশ্ব সম্পর্কিত ধারণায় যুক্তি উপস্থাপনের সূচনাটি ঠিক এভাবেই সূচিত হয়েছিল। এ বক্তব্যে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ পরিহার করা হলেও, সৌভাগ্যবশত সেকালেই এমন বস্তুবাদী চিন্তাবিদও ছিলেন, যাঁরা বস্তুর অস্তিত্বকেই প্রথম বিচার্য বলে গ্রহণ করতেন। এর ফলেই খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেই বস্তুর গঠন সম্পর্কে আবডেরার ডেমোক্রিটাস পরমাণু-তত্ত্বের সূচনা করেছিলেন, যদিও বেলাভূমির বালুকারাশির দৃষ্টান্ত ব্যতীত তাঁর সামনে এই তত্ত্বের সমর্থন-সূচক অন্য কোনো উদাহরণ ছিল না। ফলে এই তত্ত্ব প্রয়োজনীয় সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হয় এবং পদার্থের পরম গঠন সৌকর্য আবিষ্কৃত হতে। আরো প্রায় দু'হাজার বছর লেগে যায়।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার সূত্রপাত এ কারণে যে, বিভিন্ন যুগে ও কালে মানুষ তার চারপাশের জগৎ এবং প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে বিরত থাকেনি—সে কথাটিই স্মরণ রাখা। কিন্তু বস্তুজগতের পরম শৃঙ্খলা অনুধাবনের প্রয়াস, মূলত, দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত থাকলেও ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে তা বার বার বাধাগ্রস্ত এবং বিপথগামীও হয়েছে। এই বাধা বা বিপথগামিতা কোনো ব্যক্তিগত ভ্রম কিংবা একগুয়েমির কারণে ঘটেনি—এ কথা আমরা জানি। দেশ, সমাজ বা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বিশেষভাবে সমাজের প্রভাবশালী অংশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতার কারণেই এই স্থবিরতা দেখা দিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও এ বিষয়টি বিশেষভাবে মনে রাখা যেতে পারে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনার বহু আগেই মানুষ যন্ত্রবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেছিল এবং পশু, প্রাকৃতিক শক্তি ও কম-জটিল যান্ত্রিক সুবিধা ব্যবহার করে জীবনধারণকে সহজ ও উন্নততর করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। বলা বাহুল্য মানুষের আবিষ্কারের মধ্যে আদি যন্ত্র হচ্ছে বুনন যন্ত্র। বলা যেতে পারে, পশুচর্ম ও গাছের বাকল পরিধান পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়েছিল এই বুনযন্ত্রের কারণেই। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনের মধ্যেই নিহিত ছিল এ ধরনের যন্ত্র আবিষ্কারের প্রেরণা, যা প্রধানত কুটিরশিল্প হিসেবেই ব্যবহৃত এবং কায়িক শ্রম দ্বারা পরিচালিত হতো।

যন্ত্রবিদ্যায় দক্ষতা অর্জনের মধ্যেই যে প্রাচীন বিজ্ঞানচর্চা আবদ্ধ থাকে নি—তার প্রমাণ মিশরীয়, গ্রীক, আসিরীয় ইত্যাদি সভ্যতা —এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তবে অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার মৌলিক পার্থক্য ছিল এখানে যে—গ্রীক দার্শনিকরা (বিজ্ঞানী?) সুসংহত বিশ্বচিত্রের ধারণা অর্জনের কথা চিন্তা করেছিলেন এবং বস্তুজগৎ সম্পর্কিত জ্ঞান যে বিশ্বশৃঙ্খলার পরিপূরক অংশ—এ ভাবনা তাঁদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে অঙ্কুরিত হয়েছিলো। গ্রীকদের দুঃসাহসী অভিযান ও সমুদ্রযাত্রার কারণেও বিভিন্ন

দেশের মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় লাভই গ্রীক দার্শনিকদের এরূপ বস্তুগত কাঠামো নির্মাণের চিন্তার প্রেরণা রূপে কাজ করেছিল। বিশ্বপ্রকৃতির গাণিতিক শৃঙ্খলা নির্মাণের, কিংবা আরো সঠিকভাবে বললে বলা উচিত অনুসন্ধানের, প্রেরণা প্রথম অঙ্কুরিত হয় গ্রীক দার্শনিকদের মনেই। ভাবতে আশ্চর্য লাগে আবডেরার ডেমেক্রিটাস বা অ্যারিস্টার্কাস-এর সত্যানুন্ধানী দৃষ্টি-ভঙ্গিই পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটল-এর আপ্তবাক্যের দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে প্রায় দু'হাজার বছর। বস্তুত দার্শনিক প্রতীতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণগত সমর্থনের মিলন না ঘটলে আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের ভাগ্যেও যে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতো না এ কথা হয়তো নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

গ্রীসদেশে বিজ্ঞানচর্চার ধারাটির সাথে, এতদ্‌সত্ত্বেও, আধুনিক কালের বিজ্ঞানচর্চার একটি অন্তর্গত সুষমতা কেউ কেউ হয়তো লক্ষ্য করতে পারেন। রাষ্ট্রব্যবস্থার বিপর্যয়, বহির্দেশীয়দের আক্রমণ এবং ক্রমপ্রসারণশীল রোম সাম্রজ্যের অভ্যুদয়ের কারণে গ্রীক বিজ্ঞানচর্চার সমাপ্তি ঘটে খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে। এর বহুকাল পরে ইউরোপে পুনরায় বিজ্ঞানচর্চার সূচনা ঘটে এবং প্রধানত তার যোগসূত্র ফিরে পাওয়া যায় আরবদের বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই। গ্রীক বিজ্ঞানের অগ্রগতি রুদ্ধ হওয়ার পর বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে আরবরা। কিন্তু মাঝখানে ছিল প্রায় পাঁচশো বছরের অন্ধকার যুগ। সপ্তম শতাব্দী অর্থাৎ সাতশো খ্রীস্টাব্দের দিকে আরবদের আধিপত্য বিস্তৃত হয় এশিয়া মাইনর, পারস্য, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে। দশম শতাব্দীর শেষ দিকে

মুসলিম সাম্রাজ্যের অধীন স্পেনের কর্ডোভা হয়ে দাঁড়ায় জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল। এই সময় মূল গ্রীক থেকে আরবী ভাষায় অনূদিত বহু গ্রন্থ আবার ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। এ ছাড়া মুসলিম বিজ্ঞানীদের রচিত গ্রন্থ এবং আরবী ভাষায় অনূদিত ভারতীয়দের বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থগুলিও ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা লগ্নে ল্যাটিনই ছিল বিজ্ঞানচর্চার ভাষা এবং এই ভাষা চর্চার মাধ্যমেই বিশ্বজগত ও বস্তুবিশ্বের যৌক্তিক শৃঙ্খলা উদ্ভাবনের প্রয়াসটি ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে। এ কারণেই, আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্তারকালে পরিবর্তন-বিরোধী শাসককূল ও পুরোহিত শ্রেণী যথাসময়ে বিপজ্জনক (!) বইগুলো চিহ্নিত ও নিষিদ্ধ করতে মোটেই বিলম্ব করেন নি এবং বাহুবলের সাথে সাথে ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষের ধর্মীয় পবিত্রতাবোধকে বারংবার শ্রেণীগত স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টাও করা হয়েছে সুচতুরভাবে।

৪.

মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে ইউরোপ আবার জড়তা ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াতে থাকে এবং চিন্তার জগতে যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা দেখা দেয়। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ইউরোপে শিক্ষা-ব্যবস্থা সংগঠিত রূপ গ্রহণ করে। ১১৬০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস ও বলোগ্‌না, ১১৬৭ খ্রীস্টাব্দে অক্সফোর্ড, ১২০৯ খ্রীস্টাব্দে কেম্ব্রিজ ও ১২২২ খ্রীস্টাব্দে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিদগ্ধ জ্ঞানচর্চার পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যই জোরদার হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সব কটিতেই শিক্ষার বাহন ছিল ল্যাটিন ভাষা। বিজ্ঞানচর্চার দিক থেকে এ সময়কার তাত্ত্বিক আলোচনাসমূহ ছিল মূলত

কেতাবী এবং বাগ্‌বিস্তারমূলক। কিন্তু তা-সত্ত্বেও মধ্যযুগের এই পর্যায়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কারিগরি জ্ঞানের দ্রুত প্রসার ঘটে। এ সময় হাওয়া কল, জলচক্র, চক্রবাহী লাঙ্গল, পানিসেচের জন্য কূপখনন, পানিশোধন ইত্যাদি বিষয়ে যেমন ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে তেমনি কাঁচশিল্প, বারুদের ব্যাপক ব্যবহার, খনিজ সম্পদ আহরণ এবং রাসায়নিক অ্যাসিড তৈয়ার ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিশেষ নৈপুণ্য অর্জিত হয়। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে জন গুটেনবার্গ কর্তৃক স্থানান্তরযোগ্য টাইপের সাহায্যে ছাপার পদ্ধতি আবিষ্কার। বস্তুতঃ এ ভাবেই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্য ইউরোপের জন-মানস প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

মনে রাখা দরকার যন্ত্রের উদ্ভাবন ও ব্যবহার ছিল উৎপাদন, বাণিজ্যপ্রসার ইত্যাদির প্রয়োজনেই। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে অধিযন্ত্রবাদী ঐতিহ্যই প্রধান হয়ে ওঠে। অধিযন্ত্রবাদীরা চেয়েছিলেন প্রকৃতির সকল অভিব্যক্তিকে যান্ত্রিক অনুষঙ্গে ফেলে বিচার করতে, যন্ত্রবিদ্যার সূত্র দিয়ে বিশ্লেষণ করতে। তবে গণিত যেহেতু আদি বিজ্ঞানচর্চার কাল থেকেই পরিপুষ্ট এবং যন্ত্রবিদ্যার সম্পূরক, অতএব গণিত ও যন্ত্রবিদ্যার চর্চাই বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ইউরোপের নবজাগরণের এই পর্যায়ে পোল্যাণ্ডের ধর্মযাজক কপারনিকাসের সৌরজগৎ সম্পর্কিত সৌর-কেন্দ্রিকতাবাদই প্রকৃত অর্থে যুক্তিবাদী পর্যবেক্ষণ ধারার প্রথম সফল প্রকাশ। বাল্টিক সাগরের তীরে ছোট একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত ফ্রাউয়েনবুর্গ গীর্জায় জীবনের শেষ তিরিশটি বছর তিনি অতিবাহিত করেন গ্রহরাজি ও নক্ষত্রমণ্ডল পর্যবেক্ষণের কাজে। সৌরকেন্দ্রিকতাবাদ নিয়ে 'নভোবস্তুসমূহের পরিভ্রমণ সম্বন্ধে' শীর্ষক বইটি রচনার কাজ ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দে শেষ হলেও বইটি প্রকাশিত হয় ১৫৪৩ সালে, লেখক যখন মৃত্যুশয্যায়। কপারনিকাসের তত্ত্ব

সমর্থন ও বিরোধিতার দীর্ঘ এক ইতিহাস রয়েছে, যা বহু ক্ষেত্রে নির্যাতন এবং সহিংস উন্মত্ততায়ও রূপান্তিরিত হয়েছিল। কপারনিকাসের তত্ত্ব সমর্থন করার কারণে গ্যালিলিওর নিগ্রহ এবং জ্যোতির্বিদ ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারার কাহিনী আমাদের সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

জার্মানীর কেপলার কপারনিকাসের তত্ত্বের কিছু গাণিতিক সংশোধন উপস্থিত করেন এবং খ্যাতিমান জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহের সংগৃহীত নভোতথ্যের বিপুল ভাণ্ডার এ কাজে তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়। মজার ব্যাপার হলো, টাইকো ব্রাহে কপারনিকাসের সৌরকেন্দ্রিকতাবাদের কট্টর বিরোধী ছিলেন এবং ব্রাহের মতাবলম্বী শিষ্য জোহান কেপলার মূলত কপারনিকাসের মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ শুরু করেছিলেন। কপারনিকাস থেকে গ্যালিলিও এবং গ্যালিলিও থেকে নিউটন পর্যন্ত বিজ্ঞানচর্চার পর্যায়টিকে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৃত সূচনাকাল হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই সময়ে—'মহাজগত সম্পর্কে অধিযন্ত্রবাদী ধারণা (পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় তখন যা ছিল ভিত্তিস্বরূপ) পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল নিউটনের কালজয়ী আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। আইজাক নিউটন (১৬৪২—১৭২৭) গতিবিদ্যা, মহাজাগতিক বলবিদ্যা, দৃগবিজ্ঞান, গণিত যাতে হাত দিয়েছেন তাতেই সফল। গ্যালিলিও-র সূত্র তিনি পতনশীল বস্তু ও গ্রহমণ্ডলীর গতি উভয়ের প্রতি প্রযোজ্য করে দেখান। গতিবিষয়ক প্রসিদ্ধ তিন সূত্রে তিনি স্থিতি ও গতি জাড্যের সংজ্ঞা রৈখিক ভরবেগ পরিবর্তনের হার এবং প্রতিটি ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়ার অস্তিত্ব নিরূপণ করেন। গতিবিদ্যার এইসব সূত্র তিনি মহাজাগতিক বস্তুসমূহ ও তাদের বিভিন্ন অনুষঙ্গে প্রয়োগ করেন। দেখান, মহাকর্ষ যে কোন বস্তুর অভ্যন্তরীণ ধর্ম, ও অভিকর্ষ-সূত্র

সমস্ত মহাজগতের প্রতি প্রযোজ্য। তত্ত্ব প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণগত আবিষ্কার, জ্যোতির্বিজ্ঞানের তিনটি দিকেই এত বিস্তৃত অবদান দ্বিতীয় আর কোন বিজ্ঞানীর আছে বলে জানা নেই। জলগতি-বিদ্যার সূচনাও তাঁরই হাতে, সান্দ্রতা ও বায়ুমণ্ডলীয় রোধ সম্পর্কে তাঁর গবেষণা বহু যুগ পরে ডুবোজাহাজ ও উড়োজাহাজের মডেল নির্মাণের কাজে সাহায্য করল। যুগ যুগ ধরে কাজে লেগেছে নিউটন প্রতিষ্ঠিত ক্যালকুলাস বা কলনবিদ্যাও। অন্তর-কলন সমাকলন ও fluxions পদ্ধতি গণিত-গবেষণা ও গণিতের প্রয়োগের ক্ষেত্রে আনল মৌল পরিবর্তন। চলরাশি ও দ্রুত পরিবর্তনশীলতার অনুশীলনে এর চেয়ে সহায়ক পদ্ধতি আর কিছু নেই। বলা হয় ভৌত ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লিভারের যে ভূমিকা বৈজ্ঞানিক মননের উন্নতিতে কলনের সেই ভূমিকা। বাই-নোমিয়াল উপপাদ্যের আবিষ্কার ও বিশ্লেষণী জ্যামিতির প্রারম্ভিক বিকাশ, দৃগবিজ্ঞানে আলোর বিচ্ছুরণ নিয়ে পরীক্ষা, এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময় আলো কীভাবে যন্ত্রবিদ্যার নীতি অনুসরণ করে দেখানো ও সূর্যের আলোকে প্রিজমের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে নানান বর্ণের আলোয় বিভক্ত করে প্রমাণ করা যে সাদা আলো আসলে বিভিন্ন মৌলিক বর্ণের আলোকরশ্মির এক সমন্বয় — এ সবও নিউটনের কৃতিত্ব।' [৩]

নিউটনের আবিষ্কার ও গবেষণাসমূহ বিচ্ছিন্নভবে দেখা হলে তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা যে কোন মানুষের মনে মুগ্ধতা ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে—এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য হচ্ছে নিউটন তাঁর পূর্ববর্তী সকল আবিষ্কার ও গবেষণাকে পদার্থবিজ্ঞানের সুসমন্বিত শৃঙ্খলায় উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম ভৌত বাস্তবতাকে গাণিতিক বিমূর্ততায় রূপান্তরিত করেন। একই সঙ্গে গণিতের বিমূর্ততা রূপান্তরিত হয় বাস্তবতার প্রতীক ব্যঞ্জনায়। নিউটনের আবিষ্কারের

সূত্র ধরেই আঠারো শতকে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানে বিপুল আবিষ্কার সংঘটিত হয়। এ সময়েই যন্ত্রবিদ্যার বলবিদ্যাধর্মী পোশাক খসে পড়ে এবং বস্তুর অভ্যন্তরে নিহিত শক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সূচনা ঘটে। আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের তালিকায় প্রতিটি বিষয় পৃথকভাবে চিহ্নিত করার পরিবর্তে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে, "১৫০০ থেকে ১৭৫০ এই আড়াইশ' বৎসরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে প্রগতি হয়েছে তা মানবজাতির পূর্ব ইতিহাসের সমগ্র জ্ঞানের সমষ্টির সমান। ১৭৫০ থেকে ১৯০০ এই দেড়শো বৎসরে আবার জ্ঞান দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯০০ থেকে ১৯৫০ এই পঞ্চাশ বৎসরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান আবার দ্বিগুণিত হয়েছে। আশ্চর্য হলেও এ কথা সত্য যে ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ এই দশ বৎসরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানুষ যে জ্ঞানার্জন করে তা পূর্ববর্তী দশলক্ষ বৎসরের আহৃত জ্ঞানের সমান।'[৪] অধ্যাপক এম. এম. হারুন-অর-রশীদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কিত এই তথ্য আমাদের এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বর্তমান বিশ্বে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিধি যেমন ব্যাপক, তেমনি পূর্বলব্ধ জ্ঞান নিয়ত অভিজ্ঞতার অংশে পরিণত হয় বলে একালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রগতি অবিশ্বাস্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কাল থেকেই বিজ্ঞানচর্চা ব্যক্তিক প্রয়াসমূলক ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করেছে এবং সংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার অংশে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রধানতঃ সরকারী অর্থানুকূল্যে পরিচালিত—বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা গবেষণা-সংস্থা যেখানেই হোক না কেন। তবে এ-সব দেশে গবেষণা কার্যক্রমের পেছনে যে ব্যয় হয় তার প্রধান অংশই হচ্ছে গবেষকদের বেতন ও

ভাতা, গাড়ির তেল খরচ, সভার আপ্যায়ন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় জনশক্তি পোষণ খাতে। অর্থাৎ মোট ব্যয়ের প্রায় দশভাগ মাত্র গবেষণার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি বা উপকরণ সংগ্রহের কাজে ব্যয় হয়। এই তথ্য বাস্তব বলে ধরে নিলে আমরা বুঝতে পারি, মেধা বা শ্রমের ব্যবহার সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে উন্নত দেশগুলোর বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা কঠিন এবং অসম্ভব। কেননা শিল্পোন্নত দেশসমূহে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণগত ব্যাপারটি মোটামুটি এর বিপরীত।

৫.

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চার এই বাস্তব চিত্রটির কথা মনে রেখেই বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রশ্নটিও আলোচিত হওয়া উচিত বলে মনে হয়। ইউরোপীয় দেশসমূহে বিজ্ঞানের ভাষা হিসাবে ল্যাটিনের স্থান বহু আগেই দখল করেছে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় ও রুশ ইত্যাদি ভাষা। এ দেশে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় ঘটেছে প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। এমন কি, বর্তমানেও প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষার বাহন হিসেবে ইংরেজীই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। উচ্চশিক্ষা কিংবা বিজ্ঞান শিক্ষার বাহন হিসেবে বাংলাভাষা ব্যবহার করা সম্ভব কি না—নীতিগতভাবে এ প্রশ্নের উত্তর জানা সত্ত্বেও প্রায়োগিক বাস্তবতার প্রশ্নটি আবারো নানা ভাবে উত্থাপিত হয় প্রায়শঃই। মনে হয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যেন ছাঁচে-ঢালা একটি বিষয়, ভাষার প্রশ্নটির সমাধান হয়ে গেলেই প্রত্যেকে বিজ্ঞান-দিগ্‌গজ হয়ে উঠবেন। এই মনে হওয়াটি মূলত বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণভাবে সঠিক ধারণার অভাবের কারণেই ঘটে থাকে (বিজ্ঞানের যে কোন শাখায় বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের সর্বশেষ ডিগ্রী লাভ করার পরও অধিকাংশ ছাত্রই বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ এবং অনুৎসাহী)।

প্রশ্নটি উত্থাপনের কারণ হলো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা কি ধরনের হওয়া প্রয়োজন—তা নির্ণয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা। প্রথমত, বিবৃতিমূলক বিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের সাথে পরিচিত হতে পারি মাত্র, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাপক তাত্ত্বিক ও পরীক্ষণগত বিবেচনার সাথে অধিযান্ত্রিক, জৈব বা অতীন্দ্রিয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও চর্চার অন্তরালের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যেমন আমাদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান প্রসারিত করে, তেমনি সমাজেতিহাসের প্রেক্ষাপটে রেখে বিচার করলে তা সঠিকভাবেই মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে মননচর্চার ক্রমবিবর্তনের গতি ও লক্ষ্য নির্দেশ করে।

এদেশে আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা সূচিত হয় ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে। ইংরেজদের জ্ঞানচর্চার ব্যাপ্তির সাথে পরিচয় ঘটানো নিশ্চয়ই উপনিবেশ ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু মুস্কিল হলো, ইংরেজী বা অন্য কোনো ইউরোপীয় ভাষা যদি কোনো অ-ইউরোপীয় শিখতে পারেন, তাহলে তাঁকে সে-সব ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি পাঠের অধিকার থেকে কোনোভাবে বঞ্চিত রাখাও চলে না। উনিশ শতকের মধ্যভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় একাডেমিক শিক্ষার প্রসার এ দেশে ঘটে। এই একাডেমিক শিক্ষার মাধ্যমেই ইউরোপের বিজ্ঞানচর্চার সাথে এদেশীয়দের পরিচয়। ফলে একাডেমিক বিজ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যেই ১৯১৪ সালের ২৭শে মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান কলেজে প্রথমে শুধু রসায়নে এম. এস-সি পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। পরে ১৯১৭ সালে মিশ্র গণিত এবং পদার্থবিদ্যায় এম. এস-সি পড়ানোর ব্যবস্থা হয়। এ সময়ে যাঁরা

বিজ্ঞান কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন—এ কথা আমাদের অজানা নয়। এ সময়ে ইংরেজীই ছিল শিক্ষার বাহন। (এবং উচ্চতর পর্যায়ে এখনো কি তা নয়?)

কিন্তু লক্ষণীয় যে, একাডেমিক বিজ্ঞানচর্চা শুরুর অনেক আগে থেকেই বাংলায় বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু বই রচিত ও মুদ্রিত হয় এবং সাধারণ্যে তা প্রচারিতও হয়। ১৮১৭ সালে চুচুঁড়ার স্কুল পরিদর্শক রবার্ট মে রচিত বাংলা গণিতের একটি বই প্রকাশিত হয়। 'যতদুর জানা যায় বাংলা ভাষায় রচিত এটিই প্রথম বিজ্ঞানমূলক বই। এর পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য বইগুলো হল: হালে সংকলিত 'গণিতাঙ্ক' (১৮১৯), শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত "জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়" (দ্বি-স ১৮১৯), হপকিন্স পীয়ার্সের "ভূগোল বৃত্তান্ত,' (১৮১৯), ইংরেজী ফার্মাকোপিয়া অবলম্বনে রচিত রামকমল সেনের "ঔষধ সংগ্রহ" (১৮১৯), স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পশুসংক্রান্ত মাসিক পুস্তিকা, পশ্বাবলী বা Animal Biography (প্রথম প্রকাশ ১৮২২)। পশ্বাবলীর প্রতি সংখ্যায় একটি পশুর বিবরণী লিপিবদ্ধ হত। এই পুস্তিকার মূল রচয়িতা ছিলেন লসন (T. Lawson) আর বাংলা অনুবাদক ছিলেন পীয়াস (W. H. Pearce)। পশ্বাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৮ সালে। পীয়র্সন (J. D. Pearson) রচিত 'ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন' সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৮২৪ সালে (দ্বি-স ১৮২৭)। শ্রীপীয়ার্স রচিত 'ভূগোল বৃত্তান্ত' ১৮২৮ সালে সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত হয়। এতদ্ব্যতীত উইলসনের (H. H. Wilson) পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত বিজ্ঞান মাসিক 'বিজ্ঞান সেবধি' (১৮৩২), শ্রীরামপুর

মিশন থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'বিজ্ঞানসার' (১৮৩৪), ও কালীকৃষ্ণ দেব অনুদিত 'সংক্ষিপ্ত সদ্বিদ্যাবলী' (১৮৩৩) বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।'[৫]

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক বই প্রকাশের এ কার্যক্রমটির সাথে সংযুক্ত ছিল পাঠশালা ও স্কুল পর্যায়ে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য খ্রীষ্টান মিশনারীদের পরিকল্পনা। তৎকালীন বিজ্ঞানচর্চার অগ্রসরতার বিষয়টুকু প্রধানত তথ্য হিসেবে পরিবেশনই ছিল হয়তো এ-সব বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে, আধুনিক বাংলা গদ্যরীতির বিকাশের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার মধ্যেও একটি গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল দে এবং সর্বোপরি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ বিজ্ঞান-সাধক বিবৃতিমূলক বিজ্ঞানচর্চাকে বিশ্লেষণী বিজ্ঞানচর্চার দিকে নিয়ে যান। বস্তুত উনিশ শতকে বাংলা ভাষা-ভাষী বিজ্ঞানীরা তাঁদের চিন্তা ও আবিষ্কার-ভাবনা মাতৃভাষায় প্রকাশে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং তাঁদের হাতেই, প্রকৃত অর্থে, বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য গড়ে ওঠে।

কিন্তু, আমরা আগেই জেনেছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর প্রযুক্তি-উদ্ভাবনা এবং মৌল বিজ্ঞানচর্চায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ মাত্র কয়েক দশক পূর্বের ব্যক্তিগত বিজ্ঞান সাধানার ধারাটিকে প্রায় বিলুপ্তি করে দেয়। ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা হয়ে ওঠে ব্যয়বহুল, বহুলাংশে প্রযুক্তি-নির্ভর এবং প্রাতিষ্ঠানিক। একই সঙ্গে মাত্র কয়েক দশকে বিজ্ঞানের নানা শাখায় এতো ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ সব আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে যে, বিজ্ঞানচর্চার সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গিও বহুক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানে আইনস্টাইনের 'আপেক্ষিকতাবাদ', হাইজেনবার্গ-এর 'অনির্দেশ্যতাবাদ', ম্যাক্স প্ল্যাংক-

এর 'কোয়ণ্টাম-তত্ত্ব' ইত্যাদি বিশ শতকের শুরুতেই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত করেছিল। এসব তত্ত্ব ছিল প্রাথমিকভাবে পদার্থবিজ্ঞানের সনাতন যুক্তিবাদকে নতুন কাঠামোগত ধারণায় উন্নীত করার অনিবার্য প্রয়াস। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির মূল ধারাটি বস্তুত পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এর ফলে চিরায়ত বিজ্ঞানের বিবৃতিমূলক ভাষার পরিবর্তে উচ্চতর গণিতের সাংকেতিক ভাষা যেমন বিজ্ঞানচর্চায় অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে, তেমনি প্রসঙ্গ ও পরিপ্রেক্ষিতের অনুষঙ্গ হিসেবে বিজ্ঞানের ভাষায় নতুন শব্দ সংযোজিত এবং পুরোনো শব্দের অর্থ পরিবর্তিত, প্রসারিত বা বিনির্দেশিত রূপ লাভ করেছে। ফলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র না হলেও আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভাষা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখছে সর্বক্ষেত্রেই। এবং একটি ব্যাপার নিশ্চিতভাবে স্মরণে রাখা দরকার যে, বিজ্ঞানে বিশেষভাবে শব্দের অর্থ বৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গ দ্বারা সীমিত ও নির্ধারিত থাকে।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানশিক্ষার পদ্ধতিগত নির্ভরতার প্রশ্নটিও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য, কারণ ; 'সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের জ্ঞান সংগ্রহ করে খুব প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতিতে, ইনফর্মালভাবে আদৌ নয়। নিজস্ব চেষ্টা, ভুলভ্রান্তি, আবার চেষ্টা—এ রকম পরীক্ষামূলক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তার বিজ্ঞান-শিক্ষা হয় না। শিল্পে বা সাহিত্যে মানুষ যেমন যা পারুক, যেটুকু পারুক নিজেই করে দেখতে পারে, বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রাথমিক পর্বে তেমনটি নয়। তাকে বই থেকে সূত্র মুখস্ত করতে হয়, অন্যের আবিষ্কারের কথা জানতে হয়।'[৬] অর্থাৎ বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে এক রকম কঠিন ধারাবাহিকতা আছে, যা একটি নিপুণ হাতে তৈরি মালার মতো। এই মালার যে-কোনো একটি ফুল খসে পড়লে বা বিবর্ণ হয়ে গেলে, মালাটি অটুট হয়তো

থাকতে পারে—কিন্তু তার গঠনগত সংবদ্ধতা বা উজ্জ্বলতা নিশ্চয়ই ব্যাহত হবে।

তৃতীয়ত, বিজ্ঞানশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এবং দেশ ও সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই শিক্ষার প্রায়োগিক সম্ভাবনা কতটুকু তা অবশ্যই সচেতনভাবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, বিজ্ঞানচর্চাকে কেবল আমাদের বস্তুগত প্রয়োজনের মধ্যেই সীমিত রাখা উচিত। আসলে আমি এ কথাই বলতে চাইছি যে, বিজ্ঞানশিক্ষার পরিকল্পনায় স্থান-কাল-পাত্রের বিষয়টি এমনভাবে বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে বিজ্ঞানশিক্ষা ভাববাদী জ্ঞানার্জন অথবা প্রযুক্তিবিদ্যা নেহাৎ কারিগরি দক্ষতায় পর্যবসিত না হয়।

৬.

এই নিবন্ধের মধ্যে আমরা মাতৃভাষার সাথে বিজ্ঞানচর্চার একটি যোগসূত্র অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। পাঠক হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে, বিজ্ঞানের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা ব্যতীত বিজ্ঞানচর্চা ও মাতৃভাষার মধ্যেকার বিশেষ সম্পর্ক কিংবা মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার বিশেষ গুরুত্ব প্রসঙ্গে কোনো আলোচনাই আমরা করি নি। এ ধরনের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়ার একমাত্র কারণ হলো ; আমরা মনে করি—এটি একটি মীমাংসিত বিষয়। শিক্ষার বাহন হিসেবে এ দেশে, শিক্ষার সর্বস্তরে, বাংলা ভাষা ব্যবহার যে অপরিহার্য সে বিষয়ে আজ আর কোনো দ্বিমত থাকার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষা ব্যবহারই সর্বোত্তম স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ ব্যাপারে প্রশ্ন ও সমস্যা-ভীতির সূচনা করেন প্রধানত তাঁরাই, যাঁরা বিজ্ঞানচর্চা

কিংবা ভাষাচর্চা কোনোটির সঙ্গেই, প্রকৃত অর্থে, সম্পর্কিত নন। এ কারণেই প্রশ্নগুলো তোলা হয় এলোমেলোভাবে, যেন যুক্তি নয়, বরং লালিত অসম্ভবই এর মূল প্রতিপাদ্য। কিন্তু সারা বিশ্বে বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপক প্রসারে, আমরা দেখি, শিক্ষার সর্বজনীনতার সাথে সাথে, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর আপন ভাষা ব্যবহারের প্রয়াসই সর্বাধিক ফলপ্রসূ। ইউরোপের দেশগুলো এবং এশিয়ার জাপান, চীন ইত্যাদি দেশ এর প্রমাণ।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন মেটানোর জন্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা কোনো বড় সমস্যা নয়। সমস্যা হলো—এ ধরনের গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করা। বরং সে ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অবশ্য-বিবেচ্য তা হলো—বিজ্ঞানচর্চা যে কেবল গ্রন্থ রচনা ও পাঠ নয়—এ সম্পর্কে সচেতন মনোভাব সৃষ্টি হওয়া। মূলতঃ বিজ্ঞানচর্চার আবশ্যিক দিকসমূহের মধ্যে রয়েছে: ১. একাডেমিক শিক্ষায় বিজ্ঞানশিক্ষার প্রকৃত গুরুত্ব নির্ধারণ; ২. বিজ্ঞানশিক্ষার পাঠক্রম নির্বাচনে বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলীর ধারাবাহিক পঠন-পাঠন; ৩. বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবহারিক দিকের উপর যথার্থ গুরুত্ব আরোপ এবং পরীক্ষণমূলক কাজের জন্য উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি; ৪. উচ্চতর পর্যায়ে বিজ্ঞানশিক্ষার বিষয়টিকে নিছক মুখস্থ-বিদ্যার বাইরে নিয়ে আসার জন্য আলোচনাভিত্তিক শিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রহণ; ৫. বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে দেশের বিজ্ঞানী, গবেষক ও বিজ্ঞানকর্মীদের নিয়মিত অবহিত রাখার ব্যবস্থা করা; এবং ৬. সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চাকে সঙ্গতিপূর্ণ করা।

এই বিষয়গুলির উল্লেখ এ কারণেই যে, বিজ্ঞানচর্চার প্রস্তুতিমূলক পর্যায়সমূহ হওয়া উচিত সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত। অন্যথায়, বিজ্ঞানশিক্ষা যেমন কেবল প্রথাগত ডিগ্রী অর্জনেই পর্যবসিত হবে, তেমনি

সফল ও কার্যকর বিজ্ঞানচর্চার বাস্তব অবস্থা সৃষ্টিও থাকবে সুদূর-পরাহত। বস্তুত বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক ও বিপুল অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশে মৌলবিজ্ঞানের চেয়ে বরং প্রায়োগিক বিজ্ঞানের চর্চাই অধিকতর গুরুত্ব পেতে বাধ্য। কিন্তু সর্বোপরি, যে কোনো দেশ বা সমাজে সুপরিকল্পিত ফলপ্রসূ বিজ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজন সমাজে বিজ্ঞানচর্চার আবশ্যিকতা সম্পর্কে সচেতন মনোভাব সৃষ্টি। এই মনোভাব প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সৃষ্টির মাধ্যমেই তৈরি হতে পারে। আর এই আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জনের মাধ্যমেই, যা মাতৃভাষায় ব্যাপক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনা ব্যতীত সম্ভব নয়। আবার ব্যাপক প্রকাশনার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক পাঠকগোষ্ঠী এবং বিষয়দক্ষ লেখক। বলাবাহুল্য, এর কোনোটিই সমাজে মননচর্চার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ-নিরপেক্ষ নয়। তাহলে এ কথাই কি ধরে নিতে হয় যে, ক্রমাগত শর্তসাপেক্ষতার নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে এবং বৃত্তাবদ্ধতাই আমাদের ভবিতব্য! অনেক উজ্জ্বল স্বপ্ন ও মহৎ আশ্বাস-বাণী সত্ত্বেও এর বিপরীত বোধে উজ্জীবিত হতে না পারার কষ্ট কি কম?

৭.

এ কথা কেন? বিজ্ঞানের ইতিহাসের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বলে—সমাজের কাঠামো ও চরিত্রের মধ্যেই বিজ্ঞানের স্থানটি নির্দিষ্ট থাকে। কারণ বিজ্ঞান মূলত জগৎ ও জীবনকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে আবিষ্কারের উপায়, পৃথক কোনো নিষ্প্রাণ যুক্তি-কাঠামো নয়। তাই সমাজ যে পরিমাণ ও যে ধরনের বিজ্ঞানচর্চা ধারণ করতে সমর্থ,

বিজ্ঞানচর্চার প্রকৃতিও হয় তদনুরূপ। সমাজের সামগ্রিক বিকাশের মধ্যে মননচর্চার যে ভূমিকা, বিজ্ঞানচর্চা তা থেকে স্বতন্ত্র কোনো বিষয় হয়ে উঠতে পারে না। ষোড়শ শতকে ইউরোপের নবজাগরণ আধুনিক বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি সূচিত করেছে এবং পরবর্তীকালে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে প্রযুক্তিগত সাফল্য বর্তমান বিশ্বে যে বিজ্ঞান-নির্ভর আর্থ-সামাজিক সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে বিজ্ঞান একটি মৌল যোগসূত্র—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞান-ভাবনা ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে এই বিশ্বজনীনতা জনগোষ্ঠীসমূহের ভিন্নতাকে ক্রমশ সংকীর্ণতর করে তুললেও সমাজ-মানসের বাস্তব দূরত্ব মোটেই উপেক্ষণীয় কোনো বিষয় নয়। বিজ্ঞানচর্চার ইতিবাচক সাফল্য অনুধাবন করার জন্য, তাই, আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের পরিপূর্ণ ও যথার্থ মূল্যায়ন অপরিহার্য। এই মূল্যায়ন ব্যতীত কেবল বাইরে থেকে টেকনিক্যাল প্রসঙ্গ আলোচনার দ্বারা বিজ্ঞানচর্চার ভূমিকা নির্ধারণ কিংবা সমাজে বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনোপযোগী প্রসার কীভাবে সম্ভব? বিজ্ঞানচর্চায় ভাষা ব্যবহারের প্রশ্নটিও তাই, ব্যাপক অর্থে, কোনো টেকনিক্যাল বিবেচনার বিষয় নয়। এ হচ্ছে সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন, যা সেই সমাজের প্রবণতা এবং আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের মনন-বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। আসল কথা হলো—প্রকৃতই আমরা বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে সমাজ প্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে আগ্রহী কিনা সে সম্পর্কে সচেতনভাবে নিঃসংশয় হওয়া। এই আগ্রহ যদি বাস্তবে সূচিত হয় তাহলেই কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ফলপ্রসূ বৈজ্ঞানিক গবেষণা—উভয় ক্ষেত্রেই 'বিজ্ঞান গবেষণায় যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন' সেই 'মেধাবী তরুণ বিজ্ঞানীর উপস্থিতি' আশা করা যেতে পারে।

এই আগ্রহ সূচনার জন্যই মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজন সর্বাধিক, কেননা বিশ্বের কোনো উদ্বুদ্ধ আত্মসচেতন জাতি মাতৃভাষার

পরিবর্তে বিদেশী ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার কথা চিন্তাও করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উক্তি : 'বিদেশী ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার একটাই ফল,—বুঝে না বুঝে মুখস্থ করা। আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন, নিজের দেশে। সেখানেও এই-রকম হয়েছিল যে অনেক বিদ্যের ভারে তাঁকে মুমূর্ষু হয়ে পড়তে হত এবং তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে, 'পরীক্ষা দেবার পর এক বছর লাগল আমাকে এই যা মুখস্থ টুখস্থ করে পাশ করতে হয়েছে তার থেকে আবার একটা মনোভাব ফিরিয়ে আনতে, যাতে আমি উদ্ভাবনী শক্তিকে সামনে রেখে, উদ্ভাবনী শক্তি অনুসারে তাকে ভাবতে পারি।' তিনি আরও একটা কথা বলেছেন যে, নানা রকম সিলেবাস ইত্যাদির ভিতর দিয়ে ভালো করে বেঁধে প্রতি ঘণ্টায় 'এই করতে হবে' রুটিন রেখে এবং প্রতি বৎসর কি প্রতি মাসে পরীক্ষা দিতে হবে—এরকম করলে আমাদের দেশের যে উদ্ভাবনী শক্তি সেটা ঠিক বেরুবে না। সৃজনী শক্তি চায় স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতা এই নয় যে পরীক্ষা হলে বই নিয়ে গিয়ে উত্তর লেখা —কিংবা মনোমত প্রশ্ন না পেলে খাতাপত্তর ছিঁড়ে দিয়ে উঠে চলে আসা। এটা ঠিক নয়। তিনি ভেবেছিলেন যে মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে, যে বিজ্ঞান সাধনা করতে এসেছে, সে সেই রকম সাধকের মনোবৃত্তি আছে বলেই এই রকম বিরস বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে রাজী হয়েছে। এগিয়ে চলতে চেয়েছে এই রকম বন্ধুর পথে। অন্ততঃ তাকে এই স্বাধীনতাটুকু দাও যাতে এর ভেতর থেকে তার চিত্তাকর্ষক বলে যা যা মনে হয়, সেই জিনিস নিয়ে তারই রস সংগ্রহ করতে সে পারে।'[৭]

আইনস্টাইন ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিজ্ঞানশিক্ষা ভাবনার একটি পরিচয় উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যায়। তা হলো, প্রাতি-ষ্ঠানিক বিজ্ঞানশিক্ষার মধ্যেও পাঠক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থী তার মনের তারুণ্য ও অনুসন্ধিৎসা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে এবং যে বিষয়টি সে শিখবে তার সাথে তার হৃদ-যোগাযোগ ঘটতে পারে। বলাবাহুল্য, আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই স্বাধীনতার বিষয়টি যে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত এ-সম্পর্কে প্রকাশ্য স্বীকৃতি রয়েছে। পাঠদানপদ্ধতি বা পাঠক্রম নির্বাচনের দায়িত্ব যে বিশেষজ্ঞদের উপর ন্যস্ত হবে বা হয়েছে, তাঁদের অবশ্যই এ-কথাটি মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে উদ্ভাবনী মনোবৃত্তি সৃষ্টি বা বিকাশের এই স্বাধীনতাটুকু অর্থবহ না হলে শিক্ষাপদ্ধতি নেহাৎ প্রথাসিদ্ধ রীতি ব্যতীত আর কিছু হতে পারে না।

তত্ত্বগত দিক থেকে এই ভাবনা নতুন কোনো প্রস্তাবনা নয়, কেননা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত সর্ববিধ সভা ও সেমিনারে সমাজ-প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় ও অনুকূল শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আশু প্রয়োজন সম্পর্কে দ্বিমত উচ্চারণের সংবাদ অন্তত আমাদের জানা নেই। কিন্তু এর বাস্তবায়নের জন্য বস্তুগত সুযোগ সম্প্রসারণ ও সৃষ্টি ছাড়াও বেশি করে যা প্রয়োজন তা হলো,—সমগ্র সমাজব্যবস্থার মধ্যে এই সম্ভাবনা সূচিত করার উপযুক্ত মানসিক আবহ তৈরি করা। বস্তুত বস্তুগত সুযোগ সৃষ্টির জন্য যেমন অর্থসম্পদ ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা বাস্তব বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

৮.

উপরের আলোচনায়, আমরা দেখতে পাই, বিজ্ঞানশিক্ষা তথা বিজ্ঞানচর্চার বিষয়টি সমাজব্যবস্থার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

কালজয়ী বিজ্ঞানসাধক আইনস্টাইন তাঁর 'সমাজ ও বিজ্ঞান' নিবন্ধে বলেছেন—

'মানবিক কর্মধারাকে বিজ্ঞান প্রভাবিত করে দু'ভাবে। প্রথমটি সবার পরিচিত : বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ প্রত্যক্ষভাবে এবং তারো চেয়ে বেশি মাত্রায় পরোক্ষভাবে মানুষের অস্তিত্বকেই পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। দ্বিতীয় উপায়টি শিক্ষামূলক, তার কাজ মনের ওপর। আপাতদৃষ্টিতে ততটা সুস্পষ্ট না হলেও প্রথম উপায়ের চেয়ে পরবর্তীটি আদৌ কম তীক্ষ্ণ নয়।

বিজ্ঞানের যে ব্যবহারিক দিকটি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে হচ্ছে, জীবনকে ঐশ্বর্যশালী করে এমন সব জিনিসের আবিষ্কার। এমন উদ্ভাবন অবশ্য জীবনের জটিলতাকেও বাড়িয়ে দেয়। বাষ্পীয় ইঞ্জিন, রেল, বৈদ্যুতিক শক্তি ও আলো, টেলিগ্রাফ, বেতার, মোটরগাড়ী, উড়োজাহাজ, ডিনামাইট প্রভৃতিকে এ জাতীয় আবিষ্কারের উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। এসবের সাথে জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের জীবনরক্ষাকারী অবদানসমূহ বিশেষ করে বেদনা উপশমকারী ওষুধ ও খাদ্য সংরক্ষণকারী উপায়-গুলি অবশ্যই যোগ করতে হবে। আমার চোখে মানুষের জীবনে এসব আবিষ্কারের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে এই যে, শুধুমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একদিন মানুষকে যে কঠোর কায়িক পরিশ্রম করতে হত তা থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। আজ আমরা অন্তত দাবি করতে পারি দাস-প্রথার অবলুপ্তি ঘটেছে। এই অবলুপ্তির জন্য আমরা বিজ্ঞানের প্রয়োগিক ভূমিকার কাছে ঋণী।'[৮]

প্রায়োগিক বিজ্ঞানের ফলপ্রসূতা সম্পর্কে আইনস্টাইনের এই বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মানবজীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনার সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়ও তো সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এই পরিবর্তন বাইরের দিক থেকে উপ-

করণ-বৈচিত্র্য এবং যান্ত্রিক সহায়তার প্রত্যক্ষ প্রকাশের দিকেই আমাদের চিন্তাকে চালিত করে—এ কথা সত্য। কিন্তু একই সঙ্গে সমাজের উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় মৌলিক রূপান্তর সম্ভব করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সমাজ-পরিবর্তনের ধারাতেও এর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা আমাদের অজ্ঞাত নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ বিজ্ঞানের এই ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।

'বিজ্ঞানের শিক্ষামূলক ভূমিকা সম্পর্কে এইকভাবে আইনস্টাইন বলেন :

'বিজ্ঞান থেকে যে সব বুদ্ধিবৃত্তিগত ধ্যান-ধারণার বিকাশ সেদিকে এবার দৃষ্টিপাত করা যাক। প্রাক্-বিজ্ঞান যুগে শুধুমাত্র চিন্তার মাধ্যমে এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল না যা সমগ্র মানবতা (মানব সমাজ ?) নিশ্চিত ও প্রয়োজনীয় বলে গ্রহণ করবে। প্রকৃতিতে যে সব ঘটনা ঘটে তার সবই যে কঠোর নিয়মের অধীন যে প্রত্যয় আরো কম ছিল। আদিম পর্যবেক্ষকের চোখে প্রকৃতির নিয়ম ছিল বিচ্ছিন্ন, খণ্ড খণ্ড যা ভূত-প্রেতে বিশ্বাস স্থাপনকে উৎসাহিত করত। তাই আজো আদিম মানুষ বিশ্বাস করে, অপার্থিব ও দৈবশক্তি তার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক।

'বিজ্ঞানের চিরঞ্জীব কৃতিত্ব এই যে নিজের এবং প্রকৃতির সামনে মানুষের নিরাপত্তাবোধের অভাবকে সে দূরীভূত করেছে। প্রাথমিক গণিত গড়ে তুলে গ্রীকরা প্রথমবারের মত এক চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছিলেন যার সিদ্ধান্ত থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই। রেনেসাঁর বিজ্ঞানীরা অতঃপর গাণিতিক পদ্ধতির সাথে সুশৃঙ্খল পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংযোগসাধনের উপায় উদ্ভাবন করেন। এই সংযোগসাধন প্রকৃতির নিয়ম বিধিবদ্ধ করার কাজকে এত নিখুঁত ও অভি-

জ্ঞতার মাধ্যমে সে সব নিয়মের সত্যতা পরীক্ষা করা এত নিশ্চিত করে তুলেছিল যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোন মতবাদ সম্বন্ধে মূলগত পার্থক্য থাকার আর কোন অবকাশ ছিল না। সেই সময়ের পর থেকে প্রতিটি জেনারেশনই জ্ঞান ও বুদ্ধির উত্তরাধিকার গড়ে তুলেছে, কিন্তু সামগ্রিক কাঠামোকে বিপন্ন করতে পারে এমন কোন সংকটের সম্ভাবনা কখনো দেখা দেয় নি।

'সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান গবেষণার খুঁটিনাটি হয়ত সামান্যই অনুধাবন করবে; কিন্তু একটি মহান ও গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞান অন্তত সে লাভ করতে পারে। সে হচ্ছে, প্রকৃতির নিয়ম বিশ্বজনীন, এই আস্থা।'[৯]

প্রকৃতির যৌক্তিক বাস্তবতা ও কঠোর গাণিতিক শৃঙ্খলার রহস্য উন্মোচনের প্রয়াসই বৈজ্ঞানিক গবেষণার মৌল প্রেরণা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 'একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্বে'র যথার্থ গাণিতিক সমীকরণ উদ্ভাবনের কঠোর সাধনাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু সত্য এই, বিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে প্রকৃতির রহস্যোদ্ধারের যবনিকাপাত ঘটবে বলে এক সময় কোনো কোনো বিজ্ঞানী বিশ্বাস করলেও মহাবিশ্বের জীবনী-গ্রন্থটির কোন্ অধ্যায়ে আমাদের অবস্থান সে বিষয়েও এখন আমরা নিশ্চিত নই। তা বলে, বিজ্ঞানী হাল ছেড়ে দেন নি। বস্তুবিশ্বের পরম সত্য উন্মোচনের লক্ষ্যে বিজ্ঞানের যাত্রা তাই এখনো অব্যাহত। এবং স্বীকার করা প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব অনুধাবনের যথার্থ তাৎপর্যও এখানেই নিহিত।

পাদটীকা

১. ধীমান দাশগুপ্ত, 'বিজ্ঞানের ইতিহাস ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' (১ম সং কলকাতা, ১৯৮২) পৃ. ১৫

২. এ. এম. হারুন-আর-রশীদ, 'মৌলিক কণা' (১ম সং ঢাকা, ১৯৮৫) পৃ. ১২

৩. ধীমান দাশগুপ্ত, বিজ্ঞানের ইতিহাস ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' (১ম সং কলকাতা, (১৯৮২) পৃ. ৭৪

৪. এ. এম. হারুন-আর-রশীদ, 'বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান' (১ম সং ঢাকা, ১৯৮৪) পৃ. ৫—৬

৫. শামসুজ্জামান খান, 'নানা প্রসঙ্গ", (১ম সং ঢাকা, ১৯৮৩) পৃ. ৭৭

৬. ধীমান দাশগুপ্ত, 'বিজ্ঞানের ইতিহাস ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (১ম সং কলকাতা, ১৯৮২) পৃ. ১৯৮

৭. দ্র. পরিচয়, কলকাতা, বর্ষ ৩৩ (১৩৭০) সংখ্যা ৭, মাঘ

৮. দ্র. তপন চক্রবর্তী ও শাহজাহান তপন সম্পাদিত, আইনস্টাইন, (১ম সং ঢাকা, ১৯৮২) গ্রন্থে স্বপন গায়েন অনূদিত আইনস্টাইনের Science and Society প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ 'বিজ্ঞান ও সমাজ'

৯. ঐ